শুভদিন

ইন্দ্রমিত্র

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
অনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
ভিভান ভট্টাচার্য

শ্রীহিমানীশ গোস্বামী
সুহৃদবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা
সাজঘর

সূচী

শুভদিন

আরেকটা ভ্যাকেন্সি হলেই দেবদাসের কপাল খুলে যায়। প্যানেলে দেবদাসের নামটিই সকলের চূড়ায় আছে, আরেকটি ভ্যাকেন্সি হলেই দেবদাস একটানে গেজেটেড অফিসার হয়ে যাবে। গেজেটেড অফিসার হয়ে গেলেই মাইনে বেড়ে যাবে, টাকা-পয়সা বড়ো কথা নয়, তার চেয়েও বড়ো কথা হলো পজিশন, পজিশন বেড়ে যাবে, আলাদা একখানা ঘর পাবে আপিসে, ঘরের সামনে সাইনবোর্ড থাকবে: শ্রী ডি. বসু, বি. এস-সি (অনার্স)।

কত লোকজন তখন অহোরাত্র হাত কচলাবে, ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিতে লোক আসবে লাইন দিয়ে, ঘন্টি মারলে চাপরাশি বিদ্যুৎগতিতে এসে সেলাম করে দাঁড়াবে।

আরেকটা ভ্যাকেন্সি হতে কতদিন লাগবে? তা, দেখুন, দিনকাল খুব খারাপ পড়েছে, কোনো বিষয়েই নিশ্চিত কিছু বলার উপায় নেই। আগের কাল হলে বুক ঠুকে বলা যেত মাসখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে, কিন্তু আজকাল জোর করে কিছু বলা অসম্ভব।

গত বছর এই আপিসেই দত্তবাবু প্রমোশন পেয়ে গেজেটেড অফিসার হয়েছেন। ভুল বলা হলো। গেজেটেড অফিসার হয়ে যাবার পরে আর কাউকে 'বাবু' বলা চলে না। 'দত্তসাহেব' বলতে হবে।

দেবদাসবাবুর কেবল দত্তসাহেবের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কপাল করে এসেছেন বটে দত্তসাহেব।

কেরানী অবস্থায় দত্তসাহেব বিয়ে করেছিলেন। দত্তসাহেবের সেই বৌয়ের রূপবর্ণনার কোনো দরকার দেখি না। কেরানীদের বৌ সচরাচর যে রকম হয়ে থাকে। গেজেটেড অফিসার হয়ে

যাওয়ার পরেও বৌয়ের চেহারার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। শাড়িতে হলুদের দাগ, উঁচু-উঁচু দাঁত, হাসতে গেলে সমস্ত মাড়ি উলঙ্গ হয়ে পড়ে। নতুন আইনে দু-নম্বর বিয়ে করাও বারণ, মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতে হয়েছে অতএব।

কিন্তু ভগবান যাকে দেন তাকে ছপ্পর ফুঁড়ে দেন, দত্তসাহেবের বেলাতেও সে নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

তিনদিনের অসুখে দত্তসাহেবের ওই বৌ পরপারে চলে গেল। দত্তসাহেবের পত্নীপ্রেমে কিছুমাত্র ভেজাল ছিল না, পত্নী বিয়োগে তিনি কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করেছেন, ব্যাকুল হয়ে হাহাকার করেছেন। সেই হাহাকার শুনেই একজন ঘটক এসে উপস্থিত হয়েছেন। দ্বিতীয় পত্নীকেও যথাসময়ে ঘরে এনেছেন দত্তসাহেব। তা এই নতুন পত্নীটি বেশ পছন্দসই হয়েছে। মডার্ণ, কালচার্ড। এত পাতলা কাপড়ের ব্লাউজ পরেন যে আড়াই কিলোমিটার দূর থেকেও তাঁর ব্রেসিয়ারের ডিজাইনটি স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ জুড়োয়।

দেবদাস অতদূর আশা করে না। সংসারে সকলেই তো আর দত্তসাহেবের মতো কপাল করে আসেনি, এ-সংসারে হত-ভাগ্যের সংখ্যাই বেশী। দেবদাসও কেরানী অবস্থায়ই সামলাতে না পেরে বিয়ে করে ফেলেছে, রাবিশ বৌ, কিন্তু স্বাস্থ্যখানা এমন মজবুত যে, দেড় ডজন বাঘেও কিছু করতে পারবে না। এ-বিষয়ে দেবদাস নিশ্চিন্ত যে, গেজেটেড অফিসার হওয়া তো সামান্য কথা, গেজেটেড অফিসার হয়ে দেবদাস রিটায়ার করার পরেও সত্যভামা (দেবদাসের বৌ) জলজ্যান্ত থাকবে, দেবদাস মারা যাবার পরেও সত্যভামা বিধবা হয়ে অনন্তকাল সরকারী পেনসন টেনে যাবে। সেদিকে কোনো আশা-ভরসা নেই, এখন গেজেটেড অফিসার হয়ে যেতে পারলেও জীবনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাওয়া যায়।

আপাতত সত্যভামাই দেবদাসের জীবনের ধ্রুবতারা।

সেদিন বাড়িতে ফিরে রাত্রে রুটি খেতে-খেতে দেবদাস সত্যভামাকে বলল—একটা খবর আছে। আরেকখানা রুটি দাও।

বিরস মুখে সত্যভামা বলল—চারখানা কিন্তু খেয়ে ফেলেছ, হিসেব করে খাও। কী খবর?

দেবদাস আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, আরেকখানা রুটি না দিলে বৌকে সুখবরটি দেওয়া হবে না। চুপ করে রইল দেবদাস।

রান্নাঘরে ও শোবার ঘরে প্রত্যেক সতীসাধ্বীই অন্তর্যামী। রাগ করে স্বামীর পাতে আরেকখানা রুটি ছুঁড়ে দিয়ে সত্যভামা বলল—খাও। খাও। এবার বলো।

দেবদাস গম্ভীর মুখে বলল—বলছি। কিন্তু কথাটা তুমি গোপন রেখো। পাঁচকান করো না।

সত্যভামা ভুরু কুঁচকে বলল—আমার মুখ থেকে কখনো কোনো কথা পাঁচকান যায় না, আমি অন্য মেয়েদের মতো নই, কথা পেটে রাখতে জানি, তা না হলে তোমাকে আর আরামে সংসার করতে হতো না। বলো—কী খবর।

আর কোনো ভনিতা না করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেবদাস বলল—জানো, আরেকটা ভ্যাকেন্সি হলেই আমি গেজেটেড অফিসার হয়ে যাব। আপিসে সবাই বলাবলি করছিল।

কথাটা শুনে সত্যভামার দু'খানা গাল গোলাপী হয়ে উঠল, লজ্জায় দু-চোখ মাটির দিকে ঝুলে পড়ল। সত্যভামার এমন সলজ্জ সুন্দর মূর্তি ফুলশয্যার রাত্রির পর দেবদাসের আর চোখে পড়েনি। না চাইতেই দেবদাসের পাতে আরেকখানা রুটি দিল সত্যভামা। বলল—খাও। খাও। লজ্জা কিসের। না খেলে শরীর টিকবে কেন?

লজ্জা না করে আরো একখানা রুটি খেয়ে দেবদাস উঠে পড়ল। রাত্তিরে দেবদাসের পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে সত্যভামা বলল—ওগো, আরেকটা ভ্যাকেন্সি কবে হবে?

আরেকটা ভ্যাকেন্সি হলেই দেবদাসের কপাল খুলে যায়। কিন্তু কতদিনে হবে আরেকটি ভ্যাকেন্সি?

দু-রকমে ভ্যাকেন্সি হতে পারে। এক রকম: উপরালাদের একজন ইস্তফা দিলে বা রিটায়ার করলে অথবা ইহলোক থেকে

বিদায় নিলে একটা ভ্যাকেন্সি হতে পারে। আরেক রকম: গবর্ণমেণ্ট নতুন একটা পোস্ট স্যাংশন করলে একটা ভ্যাকেন্সি হতে পারে।

বড় সাহেব গবর্ণমেণ্টের কাছে কড়া ভাষায় লিখলে নতুন একটা পোস্ট স্যাংশন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, দেবদাসের প্রমোশনের জন্য বড় সাহেব অযথা অত পরিশ্রম করতে যাবেন কেন? দেবদাস মনে মনে বলল—আমি যদি তেল-মালিশে ওস্তাদ হতাম তো হয়তো বড় সাহেব গলে গিয়ে আমার জন্য একটা কিছু করতেন। কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ সকলে জানে, ঘুষ কিংবা তেল-মালিশে আমি নেই।

উপরালাদের কেউ কি ইস্তফা দেবে? পাগল হয়েছেন!

ওপরালাদের কেউ কি রিটায়ার করবে? আজ্ঞে, দু-একজন করবে, দশ বছর বাদে।

তাহলে উপরালাদের কেউ কি দু'চার দিনের মধ্যে ইহকাল থেকে······? আজ্ঞে, সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—বিধাতারে দিয়ে। তবু মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা, দেবদাস প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি উপরালার শরীর-গতিক বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং কোথাও কোনো আশাপ্রদ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। দেবদাসের প্রত্যেকটি উপরালা সত্যভামার মতো পরমায়ু নিয়ে জন্মেছেন।

মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, প্রমোশনের কোনো নামগন্ধ নেই। অথচ আপিসের প্রত্যেকেই দেবদাসকে অগ্রিম অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছে--আর কি মশাই, আপনি তো ছোট ঘরে ঢুকলেন বলে! গরীবের কথা কিন্তু মনে রাখবেন, স্যর।

গোড়ার দিকে এসব অভিনন্দন নিতান্ত খারাপ লাগত না। কিন্তু এখন দেবদাস আর সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, প্রমোশন বিলম্বিত হচ্ছে বলে দেবদাসকে যেন সকলে টিটকিরি দিয়ে যাচ্ছে। শালারা!

ওদিকে, বলতে গেলে, নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে

দেবদাস। আচ্ছা, সত্যভামার কাছে প্রোমোশনের কথা বলার কি দরকার ছিল? কোনো দরকার ছিল না, ফূর্তির মুখে কথাটা বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে গিয়ে এখন হয়েছে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। এখনও কোনো প্রমোশন হচ্ছে না, সে বিষয়ে প্রত্যেক রাত্রে সত্যভামার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে।

রোজ রাত্রে পিছন ফিরে সত্যভামা কাঁদতে থাকে—এমন মানুষের হাতে পড়েছি যে, সময়মতো প্রমোশন পর্যন্ত হয় না। পাড়াপড়শিদের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না, ছেলে তো ধরিনি পেটে, দুই মেয়ে, তা মেয়েরা পর্যন্ত ইস্কুলে মুখ দেখাতে পারে না। বন্ধুরা ওদের টিটকিরি দিয়ে বলে, 'কই রে, তোর বাবার কদ্দুর হলো?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দেবদাস—তুমি মেয়েদের কাছেও প্রোমোশনের কথা বলেছ নাকি?

শয়নকক্ষে প্রত্যেক সতীসাধ্বীই বাঘিনী। সত্যভামাও বাঘিনীর মতো লাফিয়ে উঠে বালিশে থাবা মেরে বলল—সাতটা নয়, দশটা নয়, দুটি মাত্র মেয়ে, এদের কাছেও আমি প্রোমোশনের কথা গোপন করব কেন? কার ভয়ে? আমি কি কারো খাই, না পরি?

তর্ক করে কোনো নিষ্পত্তি হবে না, দেবদাস আবার নিরুপায়ের মতো শুয়ে পড়ল, কিন্তু সত্যভামা, ওই যে বললাম বাঘিনী, বালিশে থাবা মারতে মারতে মোহিনীর মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের জল ফেলতে লাগল।

দেবদাস কাঠ হয়ে শুয়ে রইল।

শুয়ে পড়ার আগে সত্যভামা শেষ কথা বলল—আর এক মাসের মধ্যে যদি প্রোমোশন না হয়, তো দুই মেয়েকে নিয়ে আমি বাপের বাড়ি চলে যাব, প্রোমোশন না হলে আর ফিরব না। মেয়েদের ইস্কুলে না গেলেও চলবে। যাদের বাপের ঠিকমতো প্রোমোশন হয় না, তাদের আবার কিসের ইস্কুল?

এক মাসের অনেক দেরি আছে। তার মধ্যে কপালে থাকলে

কি একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেতে পারে না? সকলেই জানে, যুদ্ধ-বিগ্রহ হলে সরকারী কাজকর্ম বেড়ে যায়, গবর্ণমেণ্ট নতুন নতুন পোস্ট বাড়িয়ে দেয়। কপালে থাকলে এক মাসের মধ্যেই একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেতে পারে। চীন চুপ করে আছে কেন? রাশিয়ার কাছ থেকে বিস্তর মালপত্র নিয়ে এসেও পাকিস্তান কেন সাধু হয়ে আছে? সব শালা জোচ্চোর, ফাঁকি দিয়ে সকলে কাজ হাসিল করতে চায়, কাজের কাজী কেউ নয়।

দিনের পর দিন যাচ্ছে, দেবদাস ক্রমশ আরো বেশী হতাশ হয়ে যাচ্ছে।

জীবনে এমন দু-একটি দুঃখ আছে, যার কথা মুখ ফুটে কাউকে বলার নয়। একটি যেমন প্রেমের দুঃখ—শ্রীরাধাকেও ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদতে হয়। প্রোমোশন না পাওয়ার দুঃখ তার চেয়ে কম মর্মান্তিক নয়। দেবদাসের হাহাকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পারে কই। ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদতে হয়। বলতে হয়—স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরেও মানুষের এই দুঃখ-কষ্ট আর সইতে পারি না, উঃ বুক ফেটে গেল। বলতে বলতে চোখের জল ফেলতে হয়।

কিন্তু চুনিলালকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। চুনিলাল দেবদাসের বহুকালের বন্ধু। ব্যাচেলর। চির-ব্যাচেলর। তার কোনো প্রোমোশনের আশঙ্কা নেই। কেরানী হয়ে ঢুকেছে, কেরানী হয়ে আছে, কেরানী হয়েই মারা যাবার আশা রাখে। মদে আর ঋণে ডুবে আছে।

চুনিলাল দেবদাসের কানের কাছে মুখ এনে বলল—আমি তোমার মনের দুঃখ বুঝি ভাই। মাতালের চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।

চুনিলালের হাত ধরে দেবদাস উদাস গলায় বলল—তুমি আমাকে একটু শান্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারো চুনিলাল? আমার যে আর সয় না।

নিজের বুকে থাবা মেরে চুনিলাল বলল—সমস্ত দুঃখীর আমি

দীক্ষাগুরু। তুমি আজই সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে চলো। দু-পেগ পেটে পড়লে সমস্ত দুঃখ কোথায় ভেসে যাবে।

কোথাও কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না, বুক ভেঙে যাচ্ছে, চুনিলালের সঙ্গে দেবদাস সন্ধ্যাবেলা একটি মদের দোকানে এসে বসল। আড়াই পেগের মতো খেতে হলো দেবদাসকে। প্রথম দিনের পক্ষে যথেষ্ট।

চুনিলাল দেবদাসকে ধাক্কা মেরে জিজ্ঞেস করল—কী হে দেবদাস, প্রোমোশনের জন্যে এখনো কী মন কেমন করছে?

দেবদাস জড়িত কণ্ঠে বলল—শালার প্রেমোশনের বুকে লাথি মারো। শাহাজাদী সম্রাটনন্দিনী, মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে?

ওষুধ ধরেছে। চুনিলাল দেবদাসের বুকে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল—চলো দেবদাস, বাড়ি চলো। অনেক রাত হয়েছে, আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মাটিতে আলগোছে একটা লাথি মেরে দেবদাস বলল—না, বাড়িতে আমি যাব না, আমি এখানে শুয়ে থাকব। এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে ভালো দেখে একটা নর্দমায় গিয়ে শুয়ে পড়ব। পার্বতীর কাছে আমি আর যাব না।

—তোমার বৌয়ের নাম পার্বতী নাকি? বাঃ, চমৎকার তো!

দেবদাস ঘাড় নেড়ে বলল—ওঃ, নো, সরি সরি। আমার বৌয়ের নাম তো পার্বতী নয়, পার্বতীকে তো আমি পাইনি। আমার বৌয়ের নাম চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী। বৌ, ভেবেছিলাম জীবনে আর কখনো কাউকে ভালোবাসব না……

খুব নেশা হয়েছে। দুঃখী লোক মদ খেলে বড়ো বেশী বকবক করে, চুনিলালের ভালো লাগে না।

একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবদাসকে পাঁজাকোলা করে তুলল চুনিলাল। দেবদাসের বাড়ির সামনে দেবদাসকে নামিয়ে দিয়ে চুনিলাল চোখের পলকে ট্যাক্সি নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

টলতে-টলতে নিজের বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল দেবদাস। এবং দরজা খুলে দিল স্বয়ং সত্যভামা।

সত্যভামার থুতনিতে হাত দিয়ে সামান্য একটু আদর করে দেবদাস বলল—আমার চন্দরমুখী!

চোখের পলকে সবকিছু বুঝতে পেরেছে সত্যভামা, সতীসাধ্বীর চোখে ধুলো দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। একটানে দেবদাসকে ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সত্যভামা। খর গলায় বলল—তোমার লজ্জা করে না? গেজেটেড অফিসার না হয়ে মদ খেয়ে বাড়ি এসেছ, তোমার গলায় দড়ি জোটে না?

আজ আর সত্যভামাকে পরোয়া করল না দেবদাস। একটি মাত্র শব্দ সামান্য বদল করে রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন আউড়ে দিল—তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে Rupee না দিলে যদি বিধি হে!

সত্যভামা রাগ করে বলল—কালই আমি বাপের বাড়ি চলে যাব, এই পোড়া সংসারে আর নয়।

পরদিন সকালে দেবদাস ঘুম থেকে ওঠার আগেই সত্যভামা দুই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। বাপের বাড়ি অবশ্যি খুব দূরে নয়, বেলেঘাটায়।

আপদ গেছে। যে-কদিন ফিরে না আসে, একটু শান্তিতে কাটানো যাবে।

সেদিন আপিসে চুনিলাল খবর দিল—আর কি ভাই, তোমার কপাল তো খুলে গেল।

বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল দেবদাসের। তবে কি অসম্ভব সম্ভব হলো এতদিনে? প্রোমোশনের অর্ডার এসে গেল?

না। না।

চুনিলাল ব্যাখ্যা করে বলল—বড় সাহেবের বিবির বাচ্চা হবে। পর-পর তিন মেয়ের পর বাচ্চা হচ্ছে, তুমি একটু তদ্বির-তদারক করো, যদি ছেলে হয় তো তোমার প্রোমোশন বড় সাহেব খুশি হয়ে আলবৎ আদায় করে দেবে। লেগে যাও হে।

দেবদাস হতভম্ব হয়ে বলল—বড় সাহেবের বিবির বাচ্চা হবে, আমি কোথায় লাগব ভাই, তাছাড়া তাঁর ছেলে হওয়া কি আমার হাতে?

তোমার হাত নয়, তোমার কপাল। তোমার কপালে থাকলে সবই হবে। উঠে পড়ো, লেগে পড়ো। যাও, বড় সাহেবের বিবিকে নিয়ে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ঘোরাঘুরি শুরু করে দাও, আঃ, আর দেরি করো না। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

বিমূঢ়ের মতো উঠে পড়ল দেবদাস। তা এভাবেও অনেকে জীবনে উন্নতি করেছে বটে। চুনিলালের মাথায় বুদ্ধিটুদ্ধি খেলে খুব। চুনিলাল কিন্তু অন্যায় কিছু বলেনি।

ভাগ্য ভালো, বড় সাহেবের কামরায় বড় সাহেব ছাড়া আর কেউ নেই, দেবদাস সোজাসুজি ঢুকে পড়ল। বড় সাহেব চোখ তুলে বারেক দেবদাসকে দেখে নিলেন—ইয়েস?

হাত কচলাতে-কচলাতে দেবদাস বলল—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলতাম স্যর, কথাটা হচ্ছে খুব প্রাইভেট, একটু কাইণ্ডলি যদি অভয় দেন···

ভ্রূকুঞ্চিত করে বড় সাহেব বললেন ইয়েস। নির্ভয়ে বলুন। কন্টিনিউ।

রুমাল বের করে নিজের মুখখানা একবার মুছে নিয়ে দেবদাস বলল—না স্যর, শুনলাম কিনা, মা-জননীর ইয়ে হবে, আপনি যদি অনুমতি করেন স্যর···বড় সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—অ্যাণ্ড সো হোআট?

মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে দেবদাস বলল—আমি কোনো দোষের কথা বলছি না স্যর, হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডে আমার ভায়রা কাজ করেন, যদি আপনার কোনো উপকারে লাগতে পারি, কথাটা কী জানেন স্যর, আজকাল তো চেনাশোনা ছাড়া, দিনকাল তো খুব খারাপ···

হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডে দেবদাসের ভায়রা কাজ করেন, এই যোগসূত্রের জন্যই বড় সাহেব দেবদাসের উপর রাগ করতে

পারলেন না। প্রসন্নহাস্যে বললেন—ইয়েস, আই সী। আচ্ছা, আপনি তাহলে সম্ভবমতো একটু খোঁজখবর নেবেন। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

হাতে চাঁদ পেয়ে গেল দেবদাস—অসুবিধে কী বলছেন স্যর, এ তো বলতে গেলে আমার, মানে আমাদের ডিউটি। আমি তাহলে চলি স্যর।

পরদিন থেকে দেবদাস বিপুল বিক্রমে লেগে গেল। আপিসে কেউ আর দেবদাসকে খোঁজাখুঁজি করে না। সকলেই জানে দেবদাস আহারনিদ্রা ত্যাগ করে হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করছে! ডাক্তারদের কাছে খোঁজ নিচ্ছে, এমন কোনো ওষুধ-বিষুধ আছে কিনা যা খাওয়ালে গর্ভিনী অবশ্যই পুত্রসন্তান প্রসব করবেন। নেই? দেবদাসের মেডিকেল সায়েন্সের উপর ঘেন্না ধরে গেল। না, ইণ্ডিয়ার মেডিকেল সায়েন্স এখনো আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেনি।

যথাসময়ে বড় সাহেবের বিবিব গর্ভ-যন্ত্রণা আরম্ভ হলো, খবর নিয়ে দেবদাস ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মেটার্নিটি ওয়ার্ডেব দরজায়। উঃ, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে, বড় সাহেবের বিবিকে দেবদাস জম্ভলা রাক্ষসীর নাম নিতে বলে দিলে ভালো করত, জম্ভলা রাক্ষসীর নাম নিলে, শোনা যায় প্রসব-যন্ত্রণা অসহ্য হয় না। অগত্যা মেটার্নিটি ওয়ার্ডের দরজায় দাঁড়িয়ে বড় সাহেবের বিবিব হয়ে দেবদাস বারংবার জম্ভলা রাক্ষসীর নাম নিতে লাগল: অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী, তস্যাঃ স্মরণমাত্রেন গর্ভিণণী বিশল্যা ভবেৎ।

সুসংবাদ, বড় সাহেবের ছেলে হয়েছে। ত্রিং করে লাফিয়ে উঠে দেবদাস ছুটে গিয়ে টেলিফোন করল বড় সাহেবকে—ইয়েস স্যর, আমি দেবদাস বসু বলছি, স্যর, খুব সুখবর, আপনার ছেলে হয়েছে।

টেলিফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বড় সাহেবের গলা পাওয়া গেল—থ্যাঙ্কিয়ু, থ্যাঙ্কিয়ু। আই কংগ্রাচুলেট ইউ, ইয়ংম্যান।

দিন কয়েক বাদে চুনিলাল বলল—আর কিছু চিন্তার নেই, বাজি মেরে দিয়েছ। প্রোমোশন তোমার হলো বলে।

কিন্তু দেবদাসের বিশ্বাস হয় না। কপালে না থাকলে কিছুতেই কিছু হবার নয়।

হঠাৎ আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। না, না, আপিসে কিছু ঘটেনি, ঘটেছে দেবদাসের শ্বশুরবাড়িতে। গল্পে-উপন্যাসে বা সিনেমায় যেমন হঠাৎ ঘটে যায়, সেই রকম হঠাৎ ঘটে গেল।

বুকে একটা ব্যথা উঠেছে, ডাক্তার ডাকারও সময় পাওয়া যায়নি, সত্যভামা বাপের বাড়ি থেকেই যমের বাড়ি চলে গেল।

খবর পেয়ে দেবদাসের বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রোমোশান পাওয়া গেল না অথচ বউ চলে গেল, এই দুঃখ বড়ো দুঃসহ।

আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল দেবদাস। শ্মশানে গিয়েও দেবদাসের কান্না থামে না।

আজকের দিনেই যেন রাজ্যের মড়া মরেছে। শ্মশানে দারুণ ভিড়। ইলেকট্রিক চিতায় মড়ার লাইন পড়ে গেছে। তিন ঘণ্টার আগে সত্যভামার লাশ চড়ানো যাবে না।

কে একজন দেবদাসকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে তুড়ি বাজিয়ে বলল—কিছু ছাড়বেন?

—মানে?

—মানে তো খুব সোজা। কিছু ছাড়লে আর তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে না, অনেক আগেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

না, ঘুষের মধ্যে দেবদাস নেই। ঘুষ আর তেল-মালিশ দেবদাসের অসাধ্য।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে দেবদাস শিউরে উঠল। সত্যভামা না হয়ে বড় সাহেবের বিবি যদি প্রসব হতে গিয়ে টেঁসে যেত? সে কথা কল্পনা করেও দেবদাসের দু-চোখ থেকে ধারায় জল পড়তে লাগল।

ভগবান বাঁচিয়েছেন। ভগবান মঙ্গলময়।

চুনিলাল শ্মশানে এসে উপস্থিত। ছুটতে ছুটতে এসেছে, হাঁপাতে হাঁপাতে দেবদাসকে জিজ্ঞেস করল—তোমার বউ কি পুরোপুরি মারা গেছে?

—আধমরাকে কেউ শ্মশানে নিয়ে আসে না, পুরোপুরিই গেছে, ডেথ-সার্টিফিকেট দেখাতে পারি। তোমার এত সন্দেহবাতিক কেন চুনিলাল?

চুনিলাল উল্লাস করে বলল—তোমার মতো ভাগ্যবান বড়ো একটা দেখা যায় না। এইমাত্র আপিসে পাকা অর্ডার এসেছে, তুমি প্রোমোশন পেয়ে গেজেটেড অফিসার হয়ে গেছ।

চুনিলালকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল দেবদাস। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। স্পষ্ট করে বলা দরকার, এটা দেবদাসের শোকের কান্না নয়।

সত্যভামাকে চিতায় তুলতে এখনও ঘণ্টা তিনেক লাগবে। দেবদাস বলল—চলো, এই সুযোগে আপিসে গিয়ে নিজের চোখে অর্ডারটা দেখে আসি। তা না হলে আজ রাত্রে ছটফট করব, চোখে ঘুম আসবে না। চলো।

আপিসে এসে নিজের চোখে অর্ডার দেখল দেবদাস। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বড় বাবুকে বলল—আমার নেমপ্লেট করতে দিয়েছেন তো? তাড়াতাড়ি করিয়ে ফেলুন। আমার কিন্তু বি. এস্-সিতে অনার্স ছিল, দেখবেন অনার্স লিখতে যেন ভুল না হয়।

কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, প্রোমোশন পেয়ে দেবদাস সহকর্মীদের অবজ্ঞা করেছে। ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে দেখা করল, হ্যাণ্ডসেক করল।

কাল থেকেই আপিসে এসে নিজের চেয়ারে গেজেটেড অফিসার হয়ে বসতে হবে। না, বউ মারা গেছে বলে দেবদাস কর্তব্যে অবহেলা করবে না।

কর্তব্যের টানে দেবদাস আবার চলে এল শ্মশানে। সত্যভামার সময় হয়ে গেছে, ইলেকট্রিক চিতায় উঠে পড়ল সত্যভামা।

এখানে দেবদাসের পিঠে কে টোকা দেয়? পিছন ফিরে দেবদাস দেখল, একটা আধবুড়ো অচেনা লোক। ইশারা করে দেবদাসকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বলল—আপনি আমাকে চেনেন না, আপনাদের দত্তসাহেব আমাকে চেনেন। ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই তিনি আমাকে পাকা কথা দিয়েছিলেন। আপনার মুখের পাকা কথা না নিয়ে আমি যাব না।

—আজ্ঞে? আপনি?

—আমি ঘটক। শুধু গেজেটেড অফিসারের দ্বিতীয় পক্ষের ঘটকালি করি, আজেবাজে কেস আমি নিই না। আপনার জন্য নতুন যে পাত্রীটি ঠিক করে রেখেছি, সেটি দত্তসাহেবের পাত্রীর চেয়েও এক ডিগ্রী সরেস। মডার্ন, কালচার্ড, একটা গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা। এমন পাতলা কাপড়ের ব্লাউজ পরেন যে পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকেও তাঁর ব্রেসিয়ারের ডিজাইনটি স্পষ্ট দেখা যায়, চোখ জুড়োয়। আপনি কী বলেন?

দেবদাস বিনয় করে বলল—আমি আর কী বলব, সবই ভগবানের ইচ্ছা।

—সেই কথাই তো বলছি, আমিও তো সেই মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছাতেই এখানে এসেছি। তা হলে আর দেরি কেন, পরশু দিনই একটা শুভদিন আছে, সেদিনই হয়ে যাক।

—না, না, সত্যভামা এখনও পুরোপুরি পোড়েনি, এত তাড়াতাড়ি হয় না।—এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেবদাস করুণকণ্ঠে বলল—পরের সপ্তাহে কোনো শুভদিন নেই?

—

সকল প্রেমিকের বিরুদ্ধে

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গান্ধীজির স্ট্যাচুর সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল জয়ন্তী। একা। এখনো হাতে বিস্তর সময় আছে। একা-একা এতক্ষণ ট্যাক্সিতে ঘোরাঘুরি করেছে, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। কোথাও এখন একটু চা খেয়ে চাঙা হয়ে নিতে হবে।

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে জয়ন্তী ভাবতে লাগল, জীবনে কখনো কি কোনো রেস্তোরাঁয় বসে একা-একা চা খেয়েছে? মনে তো পড়ে না। কিন্তু আজ হয়তো তাও খেতে হবে। সময় যখন খারাপ পড়ে তখন সুন্দরীকেও একা-একা রেস্তোরাঁয় বসে চা খেতে হয়।

হঠাৎ উল্টোদিকের ফুটপাথে চোখ পড়তে জয়ন্তীর বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। বিশাখা। কতকাল পরে বিশাখাকে চোখে পড়ল, এক পলকেই নজরে পড়ে, বিশাখা আগের চেয়ে আরো অনেকখানি মুটিয়েছে, মুখখানা বড্ড বেশি থ্যাবড়া হয়ে গেছে, তা হোক, তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে বিশাখার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্তী। আর জয়ন্তীকে দেখে বিশাখা তো আকাশ থেকে পড়ল।

—তুই? এখানে?

—তুইও তো এখানে। তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে বলেই বোধহয় এখানে এসে পড়েছি।

দু'জনেই খুব হাসল।

তারপর জয়ন্তী বলল—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বকবক করব না। চল, এখানে কোথাও বসে একটু চা খাই, চা খেতে খেতে গল্প করি।

—চল।

একটা পছন্দসই রেস্তোরাঁয় ঢুকল দু'জনে। নিরিবিলি একটা

টেবিলে বসল মুখোমুখি। চা, শুধু চা, আর কিছু না।

জয়ন্তী বলল—তুই এখন কোথায় যাবি?

—বাড়িতে।

—বিশেষ কোনো কাজ আছে?

—না-না। কেন?

—তাহলে এখন তুই বাড়িতে যেতে পারবি না। আমার সঙ্গে যাবি?

বিশাখা অবাক হয়ে বলল—কোথায় যাব তোর সঙ্গে?

জয়ন্তী খিলখিল করে হাসল। বলল—ভয় নেই, তোকে জাহান্নামে নিয়ে যাব না। আমার সঙ্গে তুই যাবি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। এমন একটা জিনিস আজ সেখানে তোকে দেখাব যে, সারাজীবন তুই ভুলতে পারবি না।

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বিশাখা বলল—কী রে?

—একটা চেক ফিল্ম। দারুণ রোম্যান্টিক ফিল্ম। এ-ছবি কলকাতায় হয়তো আর কখনো আসবে না।

—আর কখনো আসবে না?

—খুব সম্ভব না। হীরুদা আমাদের ফিল্ম সোসাইটির সেক্রেটারি। হীরুদা তো এখন ইণ্টারন্যাশনাল ফিগার, বিস্তর ইনফ্লুয়েন্স তাঁর, উনি কলকাঠি নেড়েছেন বলেই আমাদের ফিল্ম সোসাইটি এই ছবিটা পেয়েছে। হীরুদা ছাড়া আর কোনো ইণ্ডিয়ান যতই কলকাঠি নাড়ুক···

কথা শেষ না করে পট থেকে আরেকটু চা ঢেলে নিয়ে জয়ন্তী শান্ত-ঠোঁটে চুমুক দিতে লাগল।

বিশাখা চুপ।

খানিকক্ষণ বাদে জয়ন্তী উদাস গলায় বলল—এই ফিল্মটার দৌলতে আমার আরেকটা উপকার হলো। সেজন্য আমি হীরুদার কাছে কৃতজ্ঞ। হীরুদা না থাকলে এই ফিল্মটাও আসত না, আমারও পুরুষদের সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত, চিরকাল হয়তো আমি ভুল করে ভাবতাম, পুরুষদের হৃদয় আছে।

বিশাখা কিছুই বুঝতে না পেরে বলল—তুই বড্ড বেশি ফিলজফি করিস, আমি ভীষণ আকাট, খুলে না বললে আমার মাথায় কিছুই ঢোকে না রে।

—একটু সবুর কর, খুলেই সব বলব তোকে, তোকে বলে বুকটা হালকা করি। বাঃ, তোর কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি, তুই কোথায় থাকিস আজকাল?

—বিলাসপুরে। আমার হাজব্যাণ্ড সেখানেই পোস্টেড। কলকাতায় বড়ো একটা আসা হয়ে ওঠে না। এই তো হপ্তাখানেক আগে এলাম, একাই এলাম, ও আসতে পারল না, দিন কয়েক বাদেই আবার চলে যাব, আবার কতদিনে আসতে পারি কে জানে।

জয়ন্তী বলল—ভালো। বাইরে থাকাই ভালো। কলকাতা এখন আর ভদ্রলোকের থাকার যোগ্য নয়। যাক, যা বলছিলাম, তোর প্রতুল বিশ্বাসকে মনে আছে?

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বিশাখা বলল—ইকনমিক্‌সে অনার্স ছিল? চওড়া কপাল, বড়ো-বড়ো জুলফি?

—ঠিক মনে আছে দেখছি। এখন তো প্রতুল মস্ত চাকরি করে, দু-হাজার টাকা মাইনে, গাড়ি-টাড়ি সবই আছে, বিয়েও করেছিল একটা, বৌয়ের সঙ্গে সেপারেশন হয়ে গিয়ে এখন মহা আরামে আছে।

বিশাখা নিশ্বাস ফেলে বলল—তোর সঙ্গে এখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়, বাঃ, বেশ মজা তো।

জয়ন্তী দপ করে জ্বলে উঠল। বলল—জীবনে আমি আর ওই স্কাউণ্ড্রেলের মুখদর্শন করব না। খানিকক্ষণ আগেই আমি প্রতুলের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম।

কতকাল আগের কথা। সে-সময়ে সকলেই ভাবত যে জয়ন্তী হয়তো প্রতুলকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করবে। জয়ন্তীর জন্য পাগল ছিল প্রতুল। জয়ন্তী ইশারা করলে প্রতুল করতে পারত না এমন কাজ নেই। মানুষী না হয়ে জয়ন্তী যদি মোটরগাড়ি হতো তো

প্রতুল নির্ঘাত জয়ন্তীর চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে ধন্য হতো। প্রতুলকে বিয়ে না করে জয়ন্তী যেদিন প্রতুলের বন্ধু অনিমেষকে বিয়ে করল, সেদিন প্রতুল সুইসাইড করতে গিয়েছিল কিন্তু পেটের গোলমালে ঘনঘন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল বলে সেদিন আর সুইসাইড করা হয়ে ওঠেনি, আর কে না জানে, ভালো কাজে একবার বাধা পড়লে জীবনে শেষ পর্যন্ত কাজটা আর করাই হয় না।

প্রতুল বিশ্বাসেব কথা বিশাখার অজানা নেই। কিন্তু জয়ন্তী এখন প্রতুলের ওপর এমন নির্মমভাবে রেগে উঠল কেন? জয়ন্তী অবশ্যি প্রতুলকে বিয়ে করেনি, বিয়ে না করলেও জয়ন্তী বরাবর প্রতুলের প্রশংসাই করেছে।

জয়ন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—খানিকক্ষণ আগে প্রতুলের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে প্রতুল এমন ভাব করল যেন আমাকে সে আশাই করেনি, যেন আমি আজ প্রতুলের ফ্ল্যাটে গিয়ে খুব একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।

বিশাখা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল—বলিস কী, প্রতুল এতদূর ছোটোলোক হয়ে গেছে?

—অত অল্পে উতলা হোস নে রে বিশাখা। আরো আছে, শুনলে তুই অজ্ঞান হয়ে যাবি।

বিশাখার ভঙ্গি দেখে মনে হলো যে, একজন প্রাক্তন প্রেমিকের হৃদয়হীনতার বিবরণ শুনে অজ্ঞান হতে তার আপত্তি নেই।

জয়ন্তী বলে যেতে লাগল—তারপর আমি প্রতুলকে হীরুদার কথা বললাম, হারুদার ইনফ্লুয়েন্সের কথা বললাম, আমাদের ফিল্ম সোসাইটির কথা বললাম, দুস্প্রাপ্য দারুণ রোমান্টিক চেক ফিল্মটার কথা বললাম, কিন্তু ওঃ, প্রতুল মিনমিন করে বলল যে, আজ সন্ধ্যায় ও আমার সঙ্গে ফিল্ম দেখতে যেতে পারবে না।

বিশাখা দুঃখ পেয়ে বলল—বলিস কি রে জয়ন্তী, প্রতুল বিশ্বাস এত বড়ো স্কাউণ্ড্রেল হয়ে গেছে, তোর মুখের উপর 'না' বলে দিল?

জয়ন্তী কোনো কথা বলতে পারল না। তার দু-চোখে জল

চিকচিক করতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে একটু সামলে নিয়ে জয়ন্তী বলল—আমিও ছাড়িনি, প্রতুলকে বলে এসেছি, জীবনে আর তোমার মতো স্কাউণ্ড্রেলের মুখ দর্শন করব না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রতুলের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম, ভাগ্য ভালো, ট্যাক্সিটাকে ছাড়িনি। কলকাতা শহরে ট্যাক্সি পাওয়া মুখের কথা নয়, ছুটে এসে আবার ওই ট্যাক্সিতেই বসলাম, ড্রাইভারকে বললাম—কর্ণফিল্ড রোড। কিন্তু তখন সত্যি বলছি, ঘুণাক্ষরেও জানতাম না যে, যার কাছে যাচ্ছি সেও আরেকটা স্কাউণ্ড্রেল।

বসন্ত গোস্বামীর আস্তানা কর্ণফিল্ড রোডে। বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি, বসন্ত ছ-তলায় থাকে অটোমেটিক লিফটের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বসন্তের ফ্ল্যাটের দরজায় সজোরে কলিংবেল টিপে জয়ন্তী প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল।

হ্যাঁ, বসন্ত নিজেই দরজা খুলেছিল। শুকনো মুখে জয়ন্তীকে ঘরের ভেতরে ডেকে নিয়ে বসিয়েছিল।

হন্তদন্ত হয়ে গিয়েছে জয়ন্তী, বসন্তেরই প্রথম কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, বসন্ত টু শব্দটিও করেনি। এমন শোকার্ত ভঙ্গি করে বসেছিল যেন ওর নিজের স্ট্যাচুর মুণ্ডু কাটা গেছে, যেন জয়ন্তী ওর সামনে বসে নেই, যেন কস্মিনকালেও ও জয়ন্তীর জন্য ল্যা-ল্যা করেনি। হ্যাঁ, সব শেয়ালের এক রা, শেষ পর্যন্ত সব প্রেমিকের এক ধারা।

জয়ন্তী সময় নষ্ট করেনি, সময়ের দাম আছে, সময় কারো জন্য বসে না, জগতে যাই ঘটুক, ওই ফিল্ম ঠিক সময়েই আরম্ভ হবে এবং ঠিক সময়েই শেষ হবে, হীরুদার ফিল্ম সোসাইটিতে কখনো কোনো অনিয়ম হয় না।

বসন্তের হাত ধরে জয়ন্তী বলেছিল—জীবনে এমন চান্স হয়তো আর পাবে না বসন্ত, এই ফিল্ম আর কখনো হয়তো ইণ্ডিয়ায় আসবে না, চলো দু'জনে পাশাপাশি বসে দেখে আসি। জীবনে পরম লগন করো না হেলা।

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে বসন্ত। এবং ঠিক প্রতুলের

গলা ধার করে বলেছে—আজ সন্ধ্যায় আমি ফিল্ম দেখতে যেতে পারব না। তুমি মাপ করো জয়ন্তী।

কিছুক্ষণ আগের মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ দিতে-দিতে কান্নায় ভেঙে পড়ল জয়ন্তী। বিশাখা কী করবে, কী বলবে, কিছুই ভেবে উঠতে পারল না। জয়ন্তীর জীবনে আজ যে-সব দুঃখের অভিজ্ঞতা হলো তা যেমন করুণ তেমনি গভীর। বিশাখা জানে, এসব দুঃখে সমস্ত সান্ত্বনা অচল। হে ঈশ্বর, জয়ন্তীকে দুঃখ সহ্য করার শক্তি দাও।

নিজের চোখের জল মুছে বিশাখা বলল—কাঁদিস নে জয়ন্তী, শক্ত হ, মানুষ চিনতে পারাও একটা মস্ত লাভ। একটু কফি খাবি? খা। বয়, কফি লে আও।

সময় হয়ে গেছে এবার উঠে পড়তে হয়। কপাল ভালো বলতে হবে, রাস্তায় এসেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস।

পছন্দসই সীটে গিয়ে বসল দু'জনে। ফিল্ম আরম্ভ হওয়ার আগে এখানে কোনো বিজ্ঞাপন দেখতে হয় না, কোনো সরকারী তথ্যচিত্র দেখতে হয় না। তার বদলে অনেক ভালো জিনিস হয়, চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শোনা যায়।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলেন কনসাল-জেনারেল। বিশাখার খুব ভালো লাগল। আগে বিশাখা কোনোদিন স্বচক্ষে চেক সাহেব দেখেনি। একটা নতুন জিনিস দেখা হয়ে গেল।

তারপর ভাষণ দিতে উঠলেন ডঃ গুরুপদ খাঁ। গলাবন্ধ কোট, বুক পকেটে জ্যান্ত গোলাপ।

জয়ন্তী বিশাখার কানে-কানে বলল—ওঁর বক্তৃতা খুব মন দিয়ে শুনবি, চেক-ফিল্ম সম্পর্কে আমাদের দেশে খাঁ সাহেব একজন অথরিটি।

ডঃ গুরুপদ খাঁ উদাস গলায় ভাষণ দিতে লাগলেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চেক-ফিল্ম পুরনো পথ ছেড়ে নতুন পথের দিশারী

হয়েছে, নতুন চেক ডিরেক্টরেরা নতুন চিন্তা ও সৌন্দর্য নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাদের সমস্ত চিন্তা ও সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বদেশী সংস্কৃতির গভীর যোগ আছে। সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন নন, সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করার সাহস ও স্বাধীনতা তাঁদের আছে। প্রত্যেক বছর নানা ফিল্ম ফেস্টিভালে চেক-ফিল্ম বিস্তর পুরস্কার পায়, পৃথিবীতে বর্তমান-কালে চেক-ফিল্মের সম্মান ও জনপ্রিয়তা অসামান্য। একালের চেক-ফিল্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ভিগার, ভ্যারাইটি অ্যাণ্ড মডার্নিটি। আজ আপনারা যে চেক-ফিল্মটি দেখবেন···

অতঃপর ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে গুরুপদ খাঁ আজকের দর্শনীয় দুষ্প্রাপ্য দারুণ রোম্যান্টিক চেক ফিল্মটি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব নিবেদন করলেন, কনসাল-জেনারেলের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং হীরুদার প্রশংসা করতে গিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে, বুকপকেট থেকে জ্যান্ত গোলাপটি ছিটকে ডায়াসে পড়ে গেল। হীরুদা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি এক লাফে জ্যান্ত গোলাপটি কুড়িয়ে এনে আবার ডঃ গুরুপদ খাঁয়ের বুকপকেটে ফুটিয়ে দিলেন।

জয়ন্তী বিশাখার কানে-কানে বলল—মার্ভেলাস।

বক্তৃতার পালা শেষ। ফিল্ম আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। জয়ন্তী গলা টান করে বিশাখাকে বলল—তুই বল, সুযোগ পেয়েও যারা এই ফিল্ম দেখে না তারা কি মানুষ?

—তুই প্রতুল আর বসন্তের কথা বলছিস? হ্যাঃ, ওরা আবার মানুষ। ওদের কথা তুই ভুলে যা, ওদের নাম তুই আর কখনো মুখে আনিস না, ওদের নাম নিলে পাপ হয়।

জয়ন্তী সুন্দর ছন্দে হাসল।

—তুই যাই বলিস জয়ন্তী তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোর সঙ্গে দেখা না হলে এই ফিল্মটা আমার দেখাই হতো না, সারা-জীবনে জানতেই পারতাম না, কী দারুণ মিস করেছি।

তারপর সেই দারুণ ফিল্ম আরম্ভ হলো। উঃ, কী ট্রিটমেণ্ট,

কী কম্পোজিশন, কী মিউজিক, কী মডার্নিটি, আঃ। সমস্ত অডিটোরিয়াম বিগলিত হয়ে ফিল্মটির আদ্যন্ত চেটেপুটে দেখতে লাগল।

এখানে ফিল্মের কাহিনীটি নিবেদন করতে পারলে চমৎকার হতো, কিন্তু তাহলে আসল কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য লাইনে চলে যেতে হয়। মোটামুটি এটুকু কথা বলা যেতে পারে যে, এই ফিল্মের সুন্দরী নায়িকা বিস্তর স্কাউণ্ড্রেল পুরুষের পাল্লায় পড়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত নায়িকার চরিত্রমাহাত্ম্য, হৃদয়-মাধুর্য এবং প্রেম-ভালবাসার মহিমার কাছে সমস্ত স্কাউণ্ড্রেল পুরুষের এমন তুর্গতি হলো যে, ব্যাটাচ্ছেলেরা কেঁদে আর কূল পায় না।

এ তো আর হিন্দী ফিল্ম নয় যে, অনন্তকাল ধরে চলবে, শেষ হয়ে গেল। রাত আটটাও বাজেনি। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কী হবে, জয়ন্তী বলল—চল, এসপ্ল্যানেডে গিয়ে একটু এসপ্রেসো কফি খাই, তারপর ধীরে-সুস্থে বাড়ি যাব।

সেই ভালো।

ট্যাক্সি। এসপ্ল্যানেড। একটা ঠাণ্ডা কফি-ঘরের কোণের দিকের নিরিবিলি টেবিলে বসল তু'জনে। দোঠো এসপ্রেসো কফি।

শুধু কফি? আর কিছু না?

আউর এক প্লেট পটেটো চিপস।

জয়ন্তী গুনগুন করে গান ধরল—মন রয় না রয় না রয় না ঘরে চঞ্চল প্রাণ।

এই এসপ্রেসো কফি জিনিসটা বড়ো চমৎকার। কফি বানানোর সময়ে মেসিনের ভেতরের আওয়াজ শুনলে অবশ্যি মনে হয় যে, মেসিনের পেট সুস্থ নেই কিন্তু কফিটি মুখে দিলেই সে-সব ভুল ধারণা ভেঙে যায়। স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব। একটানে শরীরে ফূর্তি চলে আসে।

কিন্তু যে যাই বলুক, মনের তুঃখ কিছুতেই যায় না। আজ তুপুরের কথা জয়ন্তীর পক্ষে চট করে ভোলা কঠিন।

বিশাখাও তো মেয়ে, খানিকটা জেনে গেছে, বাকিটা বুঝে নিতে

বিশাখার এখন আর কোনো অসুবিধা নেই। দু-তিনটি চুমুক সেরে বিশাখা বলল—কলেজ-লাইফে আমরা বলতাম, ফাইভ মাস্কেটিয়ার্স। প্রতুল, বসন্ত, অমলেশ, নিরুপম আর সুমিত্র। স্পষ্ট মনে আছে, ওরা পাঁচজন সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকত, দারুণ বন্ধুত্ব পাঁচজনে, আর প্রত্যেকেই তোর জন্যে পাগল।

হায় পুরনো সেই দিনের কথা সে কি ভোলা যায়। কিন্তু জয়ন্তী গাঢ় গলায় বলল—পুরনো দিনের কথা আমাকে ভুলতেই হবে। আজ দুপুরেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, পুরুষেরা প্রেম-ভালোবাসার কিছুই বোঝে না, ওরা শুধু ন্যাকামি করতে ওস্তাদ, আসল কাজের সময় ওরা কেবল বাজে অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ে।

একটানে অনেক কথা বলে ফেলেছে, নিঃশ্বাস নেবার জন্য জয়ন্তী একটুখানি থামল। তারপর আবার আরম্ভ করল—নিরুপম আর সুমিত্রের কথা শুনবি? আজ দুপুরে নিরুপম আর সুমিত্রকেও আমার চেনা হয়ে গেছে। সব এক গোয়ালের গোরু, এক সানকির ইয়ার।

বিশাখা জিজ্ঞেস করল—আজ দুপুরে তোর তো তাহলে খুব ঘোরাঘুরি গেছে। তারপর তুই নিরুপমের কাছেও গিয়েছিলি, সুমিত্রের কাছেও গিয়েছিলি?

—বত্রিশ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছি।—জয়ন্তী ক্লান্ত স্বরে বলল—কিন্তু স্কাউণ্ড্রেলগুলোকে হাড়ে-হাড়ে চিনতে পেরেছি, বত্রিশ টাকা তার কাছে কিছুই না।

বিশাখা আপত্তি করে বলল—বত্রিশ টাকাই বা বেঘোরে যাবে কেন? এই চেক ছবিটা যদি তোর আগে দেখা থাকত, তাহলে হয়তো তোর আর টাকা খরচ করতে হতো না, বত্রিশ টাকা খরচ না করেও স্কাউণ্ড্রেলগুলোকে হাড়ে-হাড়ে চিনতে পারতিস।

জয়ন্তী একমত হয়ে বলল—তা পারতাম। কিন্তু হাতে-কলমে জানলাম, তার তো অন্য একটা ভ্যালু আছে।

—ঠিক। থাক, নিরুপম কী বলল, শুনি?

একটা উঠতি হাই বাঁ হাতে চাপা দিয়ে জয়ন্তী বলল—কী আর বলল, সেই পুরনো কথা, একই কাসুন্দি। আজে-বাজে কথা না বলে আমি একটানে কাজের কথা পেড়েছি, আজ সন্ধ্যায় 'আমার সঙ্গে একটা দারুণ দুষ্প্রাপ্য চেক-ফিল্ম দেখতে চলো! যাবে?' দু-সেকেণ্ড বোবা হয়ে রইল, তারপর আমার মুখের উপর ভেউ-ভেউ করে বলল, 'না, আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে ফিল্ম দেখতে যেতে পারব না।'

বিশাখা হাত জোড় করে বলল—আর বলিস না, আর বলিস না। নিরুপম এই কথা তোকে বলতে পারল, এত সাহস? অথচ এই নিরুপম এককালে তুই পান মুখে দিলে পিকদানি নিয়ে তোর সঙ্গে ঘুরতে পারলে ধন্য হয়ে যেত।

ঘড়ির দিকে তাকাল বিশাখা। এবার উঠতে হয়।

জয়ন্তী বলল—হ্যাঁ, এবার উঠে পড়ব। সকলের কথাই সংক্ষেপে শুনলি, সুমিত্রের কথাটাও শুনে রাখ। আমার বুক একেবারে হাল্কা হয়ে যাক।

একই রকম কথা নির্ঘাৎ, তা হোক, শুনিয়ে জয়ন্তীর বুক যদি খানিক হাল্কা হয় তো শোনাই ভালো। জয়ন্তী বলুক।

জয়ন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—হ্যাঁ, এই এক কথাই। তফাতের মধ্যে এই যে, দু-চোখ থেকে ধারায় জল ফেলতে ফেলতে সুমিত্র বলেছে, 'না, আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে ফিল্ম দেখতে যেতে পারব না।'

এখন, এতক্ষণে, জয়ন্তীও আর নিজেকে সামলাতে পারল না, বিবরণ দিতে দিতে জয়ন্তীর দু-চোখ থেকেও ধারায় জল পড়তে লাগল।

বিশাখা ব্যস্ত হয়ে বলল—ওই স্কাউণ্ড্রেলদের কথা ভেবে তুই আবার কাঁদিস? পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে ওদের সকলের মুখে মেরে আসতে পারলি না?

সরল বিশাল সজল চোখ তুলে জয়ন্তী বিশাখার দিকে তাকাল, ভঙ্গিতে জানাল—ছিঃ। 'কপালকুণ্ডলা'র কথা মনে পড়ল: তুমি

অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?

রাত যথেষ্ট হয়েছে, আর দেরি করলে চলবে না। একই দুপুরে এককালের চারজন প্রেমিক সমস্বরে জয়ন্তীকে 'না' বলে দিয়েছে, এটা বিশাখার পক্ষেও হজম করা শক্ত। যদিও গুরুদেব বলে গেছেন, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ কিন্তু এই অঘটনের পরে মানুষের উপর বিশ্বাস আর কেমন করে থাকে !

বিশাখা গরম হয়ে বলল—জয়ন্তী, তোর কিন্তু একটা কথা প্রত্যেকের কাছ থেকে স্পষ্ট জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

—কী কথা ?

—কেন ওরা আজ সন্ধ্যায় তোর সঙ্গে ফিল্ম দেখতে যেতে পারবে না ?

—আমি কি সে-কথা না জেনে ছেড়েছি। সেকথা আদায় না করে চলে আসব, আমি কি তেমন কাঁচা মেয়ে ?

—কী কারণ ?

জয়ন্তী হাত নেড়ে বলল—ন্যায্য কারণ কিছুই দেখাতে পারেনি। একটা অজুহাত দিয়েছে বটে। এবং কী আশ্চর্য, প্রত্যেকে একই অজুহাত দিয়েছে যেন একটা মুখস্থ কথা প্রত্যেকে আউড়ে গেছে।

—কী অজুহাত।

—খুব বাজে অজুহাত। শুনলে তোর খুব খারাপ লাগবে। ওদের প্রত্যেকেরই ভাবখানা এমন যেন অমলেশ আমার পর, যেন অমলেশকে আমি বিয়ে করিনি, যেন অমলেশ আমার স্বামী নয়।

কিছুই বুঝতে না পেরে বিশাখা বলল, আহা, বল না, একেকটা স্কাউণ্ড্রেল কী অজুহাত দিয়েছে।

কফির বিল পেমেণ্ট করতে করতে জয়ন্তী বলল—ওরা চারজনেই আজ সন্ধ্যায় অমলেশকে নিয়ে কেওড়াতলায় যাবে ?

—কেওড়াতলায় ?

বয়কে বকশিস দিয়ে প্লেট থেকে মৌরী নিয়ে মুখে ফেলতে ফেলতে

জয়ন্তী বলল—তাছাড়া সাউথে আর বার্ণিংঘাট কোথায় ? দুপুর-বেলা হঠাৎ হার্টফেল করে মরে গিয়েই তো অমলেশ আমাকে বিপদে ফেলল। অমলেশ জ্যান্ত থাকলে তো ওকে নিয়েই চেক-ফিল্ম দেখতে আসতাম, তাহলে কি আর কোন স্কাউণ্ড্রেলকে সাধাসাধি করতে যেতাম ?

বাবার নাম

সত্যসিন্ধু আক্ষেপ করে বলল—তোমার মতো পুরুষ আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি। প্রেমে দু-একবার সকলেই ফেল হয়, কিন্তু পর পর ছ'বার প্রেমে ব্যর্থ?

লজ্জায় আমি মুখ নীচু করে রইলাম। সত্যসিন্ধুর মতো দিগ্বিজয়ী প্রেমিকের কাছে আমার মুখ নীচু করে থাকাই উচিত।

সত্যসিন্ধু উদাস গলায় জিজ্ঞেস করল—কেন তুমি পর পর ছ'বার প্রেমে ব্যর্থ হয়েছ, সে বিষয়ে কখনো কিছু ভেবেছ?

আমি কিন্তু কিন্তু হয়ে বললাম—ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাইনি ভাই। মেয়েরা গোড়ার দিকে আমাকে খুব আশা দেয়, শেষকালে কেমন যেন কেটে পড়ে।

—অ্যাবসার্ড।—টেবিলে ঘুষি মেরে সত্যসিন্ধু বলল—মেয়েদের কোনো দোষ নেই। তুমি একটা কাওয়ার্ড। তোমার মধ্যে পুরুষত্ব বলে কিছু নেই। তুমি একটা…

হাতজোড় করে বললাম—আমাকে অমন কড়া গলায় গাল-মন্দ করো না। মরে যাব। মেয়েদের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আমার হার্ট যথেষ্ট কাতর আছে।

সার্থক প্রেমিকেরা, আমি দেখেছি, চোখের পলকে মুখের ভাব বদলে ফেলতে পারে। সত্যসিন্ধু চোখের পলকে সহাস্য হয়ে গেল। বলল—আরে না, না। গালমন্দ করব কেন। আসলে আমি তোমার একটা সাক্‌সেস দেখতে চাই।

সত্যসিন্ধু যাই বলুক, আমি সেরকম কোনো ভরসা করি না। পর পর ছ'বার ব্যর্থ হয়েছি, আমার আর আশা কোথায়!

সত্যসিন্ধু শক্ত গলায় বলল—না, আশা ছেড়ে দিলে চলবে না। বিবেচনা করে দেখতে হবে তোমার এই অসাধারণ ব্যর্থতার

মূল কোথায়। প্রথম তুমি যে মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলে তার নাম কী?

আহা, আমার সেই প্রথমার নাম ছিল মীনাক্ষী। আমি মীনাক্ষীর প্রাইভেট টিউটর ছিলাম। প্রথমেই তো আর প্রেমে পড়িনি, প্রথম-প্রথম কী দারুণ বোকা মনে হতো মেয়েটাকে। একটা অঙ্ক নির্ভুল করতে পারে না, হাজার চেষ্টা করেও ওকে জোয়ার-ভাঁটা বোঝাতে পারিনি, বহুকাল পর্যন্ত ওর বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে মহামতি আকবরের বাবার নাম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। এই মেয়েকেও আমি পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু হায়, এই মেয়েটিও আমাকে প্রেমের পরীক্ষায় ডাহা ফেল করিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

কী আর বলব, প্রাইভেট টুইশনি করে মীনাক্ষীর বাবা মাসান্তে আমার হাতে যে ক'টা টাকা দিতেন, তা আমার মীনাক্ষীর বাবদেই বরাবর খরচ হয়েছে। আমার হাতে মাইনের টাকা দিয়েই মীনাক্ষী গদগদ গলায় বলত—উঃ, মাস্টার মশাই, আপনার হাতে কত টাকা! আমাকে তো পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে অন্ততপক্ষে একদিন একটা আইসক্রীম খাওয়াতেও পারেন।

বলেই টুক করে জিভ কেটে বলত—না বাপু, থাক, আপনি হয়ত ভাবছেন, মেয়েটা কি অ-স-ভ্য!

আমি অসভ্য-টসভ্য কিছুই ভাবিনি তখন পর্যন্ত। একদিন আইসক্রীম হলো, আরেকদিন চীনে খাবার, তারপর সিনেমাও দেখাতে হলো। আস্তে আস্তে এমন জমে গেলাম যে, মীনাক্ষীর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করার জন্য আমাকে সকালবেলা আরেকটা টুইশনি নিতে হলো। কেননা, মীনাক্ষীর বাবা যে টাকা দিতেন, তাতে তো খুব বেশী এগোনো যায় না।

মীনাক্ষীকে পেলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে, তখন আমার মনের অবস্থা সেইরকম নয়। তখন আমার মনের অবস্থা এইরকম যে, মীনাক্ষীকে না পেলে আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আমার তো এই অবস্থা। অথচ মীনাক্ষী দিব্যি নির্বিকার। সরলা বালিকা তো, ঘোরপ্যাঁচ কিছু বোঝে না।

মিউজিয়ামে ঢুকে মরা জন্তু-জানোয়ার দেখাতে দেখাতে আমি খুব সাহস করে একদিন মীনাক্ষীকে বললাম—জানো মীনু, আমরাও একদিন এই রকম মরে যাব।

মীনাক্ষী তাচ্ছিল্য করে বলল—এইরকম মরে যাবো ? অত আশা করবেন না স্যর। আপনি আমি মরে গেলে নিমতলায় পুড়িয়ে দেবে, এই বাড়িতে এমন যত্ন করে কেউ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবে না।

কী কথার কী উত্তর। মৃত্যুর লাইন ধরে দার্শনিক আলোচনা করতে-করতে খপ করে হাত ধরে ফেলতাম, সব প্ল্যান ভেস্তে গেল।

শেষ পর্যন্ত একদিন মরীয়া হয়ে বললাম—মীনু, আজ তোমাকে একটা দরকারী কথা বলব।

অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করে মীনাক্ষী বলল—বলে ফেলুন।

আমি আমতা-আমতা করে বললাম—কথাটা কিন্তু লেখাপড়া বিষয়ে নয়।

—আপনি কী বলবেন জানি।

—কী বলব ?

—আপনার সঙ্গে বাদশাহী হোটেলে গিয়ে বিরিয়ানি পোলাও আর মাংসের কালিয়া খেতে বলবেন। কিন্তু দোহাই আপনার মাস্টারমশাই, আজ আমি কিছু খেতে পারব না, আজ আমার দারুণ চোঁয়া ঢেকুর উঠছে।

আমি খুব ব্যাকুল হয়ে বললাম—না, না, চোঁয়া ঢেকুরের কথা নয়, এ একটা সম্পূর্ণ অন্য কথা।

মীনাক্ষী জোরে ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল—না, না, দারুণ চোঁয়া ঢেকুর···

—না, না, অন্য কথা, চোঁয়া ঢেকুর-না—

—না, না—

—না, না—

—ন্‌না—

—না। না। না।

হঠাৎ মীনাক্ষী চিৎকার করে উঠল—ছোড়্‌দা, ছোড়্‌দা। তাড়াতাড়ি এদিকে আয়।

মীনাক্ষীর ছোড়্‌দা বরাবর ব্যায়াম সমিতির চ্যাম্পিয়ান। আমার গলা-টলা শুকিয়ে গেল।

এক ডাকে অকুস্থলে ছোড়্‌দা এসে উপস্থিত।—কী রে, কী হয়েছে।

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে মীনাক্ষী বলল—আমার চোঁয়া ঢেকুর উঠছে, তবু মাস্টারমশাই আমাকে মাংস-পোলাও খেতে বলছেন। তুই কী বলিস ?

আমার দিকে তাকিয়ে ছোড়্‌দা বললেন—না, না, চোঁয়া ঢেকুরের উপর মাংস-পোলাও খাবি কেন। আর মাস্টারমশাই, আপনিও যেমন, এইসব পেটরোগা মেয়েকে কখনো ওসব দামী জিনিস খাওয়াতে আছে আপনি যখন নিতান্তই খাওয়াবেন, তখন চলুন, আমিই যাচ্ছি আপনার সঙ্গে। চলুন। শুভস্য শীঘ্রং।

অগত্যা উঠে পড়তে হলো। মীনাক্ষীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি, কিন্তু সেই ছোড়্‌দা শালাকে গাঁটের পয়সা খরচ করে বাদশাহী হোটেলে আকণ্ঠ খাওয়াতে হলো। পরিপাটি করে খেয়ে ছোড়্‌দা দু-চারটি ঢেকুর তুললেন। বোধ করি চোঁয়া ঢেকুর নয়।

দুঃখের কথা বিস্তারিত করে লাভ নেই, যথাসময়ে মীনাক্ষীর বিয়ে হয়ে গেছে, নেমন্তন্ন পেয়েছি, কিন্তু যাইনি। যাব কি, সে সময়ে আমার খুব কান্না পেত, প্রথম ধাক্কা তো। তা কলকাতায় দু-ফোঁটা জল পড়লেই রাস্তা ভেসে যায়, এ অবস্থায় আমি আর কলকাতায় বসে চোখের জল ফেলতে সাহস করলাম না। ক'টা দিন পুরীতে কাটিয়ে এলাম। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ব্যর্থ প্রেমিকের অশ্রুপাতের জন্য পুরীর সমুদ্রতীর অতুলনীয়।

যত খুশী চোখের জল পড়ুক, কারো কিছু বলার নেই।

কিছুদিন আগে মীনাক্ষীর ছেলের অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। সেই নেমন্তন্ন বাদ দিইনি। ছেলেটিকে একটা রূপোর ঝিনুক উপহার দিয়ে এসেছি। প্রথম প্রেমিকার প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন, খালি হাতে তো আর যেতে পারি না।

হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে সত্যসিন্ধু বলল—একটু সংক্ষেপে সারো ভাই। এমন ঢালাও করে বললে যে, তোমার ছ'জন প্রেমিকার ইতিহাস আমি এক জীবনে শুনে শেষ করতে পারব না।

—আমি কিছুই বলতে চাই না। তুমি শুনতে চেয়েছিলে বলে বলেছি। আমার কী দোষ?

সত্যসিন্ধু আমার পিঠ চাপড়ে বলল—না, তোমার কোনো দোষ নেই। মীনাক্ষীর ইতিহাস থেকেই আমি তোমার ক্যারেকটার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, মীনাক্ষীর বাড়ি কোথায় ছিল?

—বাগবাজারে।

—আচ্ছা, মীনাক্ষীর পর আর যাদের প্রেমে পড়েছিলে তারাও কি সকলেই তোমার ছাত্রী?

—না।

—প্রত্যেকের নাম ও বিবরণ সংক্ষেপে দাখিল কর।

আমি মুখস্থ আউড়ে গেলাম—শর্মিলা, গানের মাস্টার, কসবায় বাড়ি। অসীমা, স্কুল-টীচার, টালায় বাড়ি। তপতী, টাইপিস্ট, বেহালায় বাড়ি। ক্ষমা, কেরাণী, নারকেলডাঙায় বাড়ি। বীথি, মেয়ে-পুলিশ, নাকতলায় বাড়ি।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সত্যসিন্ধু—তোমার বাহাদুরি আছে হে। কলকাতার বলতে গেলে কোনো এলাকা বাদ দাওনি, ছাত্রী, গানের মাস্টার, স্কুল-টীচার, টাইপিস্ট, কেরাণী, মেয়ে-পুলিশ —সবরকম ঘাট ঘুরে এসেছ। এতরকম মেয়ে, কিন্তু তোমার ব্যাপারে দেখছি সকলেই একমত। কেন?

আমি বোকার মত বললাম—কেন?

সত্যসিন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলল—সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সেটা খুঁজে বের করতে পারলেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না। আচ্ছা, কোনো ব্যাপারে এই ছ'জন মেয়ের মধ্যে কোনো মিল তোমার চোখে পড়েছে ?

আমি আনায়াসে বললাম—হ্যাঁ।

—কী ?

—সকলেই শাড়ি-টাড়ি পরে।

উত্তর শুনে আমাকে ঘুষি মারতে এসেও সত্যসিন্ধু ঘুষি মারল না। বলল—না, হাতে গন্ধ করব না।

খানিকক্ষণ উদাস হয়ে বসে রইল সত্যসিন্ধু। তারপর হঠাৎ তুড়ি মেরে বলল—হয়েছে। বলো। মীনাক্ষীর বাড়ি বাগবাজারে বললে না ?

—হুঁ।

—বরাবর বাগবাজারের বাসিন্দা—না অন্য কোথাও বাড়ি ?

—অন্য কোথাও।

—কোথায় ?

—জেলার নাম জানি। বলব ?

—বলো।

—মেদিনীপুর জেলা।

—শর্মিলার বাড়ি কোন জেলা।

—হুগলী জেলা।

—অসীমার বাড়ি কোন জেলা ?

—চব্বিশ পরগণা জেলা।

—তপতীর বাড়ি কোন জেলা ?

—বর্ধমান জেলা।

—ক্ষমার ?

—বাঁকুড়া জেলা।

—বীথির ?

—নদীয়া জেলা।

সত্যসিন্ধু নিঃশ্বাস ফেলে বলল—সেদিকেও তো মিল নেই। সব তো আলাদা জেলার মেয়ে। তাহলে আসল রহস্য কোথায়? ছ'জনেই কেন তোমার ওপর বিরূপ বল? কেন, কেন, কেন? দাঁড়াও, আরেকটু ভাবি।

আমি হাতজোড় করে বসে রইলাম। সত্যসিন্ধু একমনে ভাবতে লাগল। দেখি।

খানিকক্ষণ বাদে সত্যসিন্ধু আবার প্রশ্ন করল—মীনাক্ষীর বাবার নাম কী?

—ভূপতি ঘোষ?

—শর্মিলার বাবার নাম কী?

—ভূপতি বসু।

—অসীমার বাবার নাম কী?

—ভূপতি গুহ।

—তপতীর বাবার নাম কী?

—ভূপতি মিত্র।

—ক্ষমার বাবার নাম কী?

—ভূপতি সরকার।

—বীথির বাবার নাম কি?

—ভূপতি ভৌমিক।

হঠাৎ সত্যসিন্ধু আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—পেয়েছি। মার দিয়া কেল্লা। আর ভয় নেই।

আমি করুণস্বরে বললাম—তোমার মনের কথা আমাকে একটু প্রকাশ করে বলো। আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

এতক্ষণে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সত্যসিন্ধু বলল—ভূপতিই তোমার কাল। যে কোনো কারণেই হোক, কোনো ভূপতির মেয়ের সঙ্গে কখনো তোমার প্রেম হবে না। তোমারও এমন কপাল যে, প্রত্যেকবারই একটা না একটা ভূপতির মেয়ের প্রেমে পড়েছ। এখন তো সব জেনে গেলে, এখন আর ভয় কী?

যেন একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। তবু আমার সাহস

হয় না। ভয়ে ভয়ে বললাম—সত্যসিন্ধু, ছ'বার তবু সয়ে গেছে, সাতবারেও যদি ব্যর্থ হই তো অবস্থা খুব সাংঘাতিক হবে কিন্তু। ডুবে যাব না তো ?

আমার সমস্ত ভয় দরাজ হাসিতে উড়িয়ে দিয়ে সত্যসিন্ধু বলল—পাগল হয়েছ নাকি ? এই সাতবারের বার যার প্রেমে পড়বে, আমি বলে দিচ্ছি, তাকে তুমি তিন তুড়িতে সাত পাকে বেঁধে ঘরে এনে ফেলতে পারবে। কেবল একটি বিষয়ে সাবধান, খুব সাবধান, এই মেয়েটির বাবার নাম যেন কিছুতেই ভূপতি না হয়।

মেয়েটির নাম বনানী।

না, প্রথমেই আমি বনানীর প্রেমে পড়িনি।

আগে ওর বাবার নাম জানি। প্রেমের কথা পরে হবে। ওর বাবার নাম যদি কপালগুণে ভূপতি হয়, তাহলে তো ওর সঙ্গে আমার প্রেমের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর আমাকে ঠকানো চলবে না, সত্যসিন্ধুর কৃপায় এতদিনে আসল রহস্য জেনে গেছি।

গোড়াতেই আসল রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেলে আমাকে আর কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকতে হয় না। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এগোতে পারি।

সাহস করে আমি একদিন বনানীকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কি ভূপতিবাবুর মেয়ে ?

জোড়া ভুরু আকাশে তুলে বনানী বলল—কে ভূপতিবাবু ? কোন ভুপতিবাবু ?

—ওঃ, ভুপতিবাবুর মেয়ে নন ? তাহলে আপনার বাবার নাম কী ?

—রামনাথ কাঞ্জিলাল।

মার দিয়া কেল্লা। বনানী ভূপতির মেয়ে নয়। আমার মনের মধ্যে দারুণ উল্লাস হলো। এবং প্রেম এমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল যে, আমিই ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। পনেরো দিনের

মধ্যে আপনি-আপনির পাট চুকে গেল, দিব্যি তুমি-তুমি হয়ে গেলাম। আপনা-আপনির মধ্যে আবার আপনি কিসের।

শীতের দুপুরগুলি পাখা মেলে উড়তে লাগল। আজ ডায়মণ্ড-হারবার, কাল ব্যাণ্ডেলের গির্জা, খুব ঘন ঘন চিড়িয়াখানায় যাই। ঝিলে হাজার পাখি, কিন্তু সেদিকে আমাদের আমোদ নেই, চিড়িয়াখানায় আমাদের আমোদ হয় সাপের ঘরে।

সাপ দেখে বনানী দারুণ ভয় পায়। আমি বনানীর হাত ধরে বলি—ভয় কিসের, আমি তো আছি। তুমি যখন রামনাথবাবুর মেয়ে তখন আর পরোয়া কিসের।

একদিন আউটরাম ঘাটে গিয়ে নৌকোয় ওঠা গেল। ফুরফুরে হাওয়ায় আমার কেবলি মনে হতে লাগল আমার সঙ্গে এখন যে মেয়েটি আছে তার বাবার নাম ভূপতি নয়। বললাম—বন্ধু, রামনাথবাবু তোমাকে খুব ভালোবাসেন ?

—খুব। উঃ আমার দারুণ মাথা ধরেছে।

মাথা ধরেছে যখন, কী আর করা, আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল বনানী। আমি ওর মাথা টিপতে-টিপতে বললাম—বন্ধু, আমার রামনাথবাবুর কথা শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। বলবে ?

—হুঁ।

—বলো।

—বাবাকে তোমার সব কথা বলেছি। সব কথা শুনে বাবা তোমাকে খুব পছন্দ করেছেন। তোমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছেন।

আমি ভয় পেয়ে বললাম—না, না, বাড়িতে হয়তো তোমার ব্যায়ামবীর ভাই-টাই আছে। ও-অবস্থায় আমার তোমাদের বাড়িতে যাওয়া উচিত নয়।

খিলখিল করে হেসে উঠল বনানী। বলল—না, আমার কোনো ভাই নেই। আমি, বাবা, মা—ব্যস। যাবে আমাদের বাড়িতে ?

—না, না। তোমার নিজের ভাই না থাকলে কী হবে, পাড়াতুতো ভাই নির্ঘাৎ আছে। তারা পাড়াতুতো বোনের

প্রেমিককে খালি মাথায় সুনজরে দেখে না।

—খালি মাথায় মানে?

—মানে টোপর পরে গেলে কিছু বলবে না। খালি মাথায় গেলেই, আর কিছু না করুক, আড়াল থেকে থান ইট ছুঁড়বে। আগে গিয়ে লাভ কী, টোপর পরে শুভদিনে গিয়ে উদয় হবো, সেই ভালো। তোমার বাবা যখন রামনাথবাবু তখন আর ভাবনার কিছু নেই।

বাবুঘাট থেকে একটা লঞ্চ গঙ্গা পারাপার করে। বনানীর খেয়াল হলো, সেই লঞ্চে উঠে কয়েকবার গঙ্গা পারাপার করবে। চলো, তাই করি। রামনাথবাবুর মেয়ের কথায় আমার কোনো আপত্তি নেই।

দু'দিন বাদেই একটা সাংঘাতিক ঘটনা হলো। হঠাৎ দিল্লীতে একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। গড়ের মাঠে আমার পাশে বসে বনানী একটু কাঁদাকাটা করল, আমিও রুমালে দু-একবার চোখ মুছলাম। বললাম, একদিকে তো ভালোই হলো। রামনাথবাবু যখন আমাকে পছন্দ করেছেন, তখন আর কথা কী। বছরখানেক বাদে চাকরিতে পাকা হয়ে যাব, তোমাকে বিয়ে করে একেবারে দিল্লী নিয়ে যাব, নিশ্চিন্ত, চমৎকার।

—কবে যেতে হবে তোমাকে?

—পরশু। টিকিট হয়ে গেছে।

—গিয়ে আমাকে ঠিকমতো চিঠি লিখবে কিন্তু। ওখানে গিয়ে যেন আবার কোনো ডাকিনী-যোগিনীর পাল্লায় পড়ে যেও না।

আমি কষ্ট পেয়ে বললাম—ছিঃ বন্ধু, রামনাথবাবুর মেয়ে হয়ে তোমার কী আমাকে এরকম বলা উচিত?

ঝট করে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিঁথিতে ছোঁয়ালো বনানী। বলল—আমাকে মাপ করো। আর কখনো এমন বলব না।

দিল্লী থেকে চিঠি লিখি, খুব তাড়াতাড়ি বনানীর কাছ থেকে উত্তর চলে আসে। ছ-মাস এইরকম চললো। বড়ো মজায় আছি।

ছ-মাস বাদে হঠাৎ উত্তর আসা বন্ধ হয়ে গেল। কথা নেই,

বার্তা নেই, এ কেমন কাণ্ড। পোস্টাপিস কি তাহলে ঠিকমতো সার্ভিস দিচ্ছে না?

রেজিস্টারি ডাকে চিঠি দিলাম পর পর আটখানা। কোনো সাড়া নেই।

তিনবার টেলিগ্রাম করলাম। কোনো শব্দ নেই।

বড়ো সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। না, বনানীর বাড়িতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি জানি কোথায় বনানীকে পাওয়া যাবে।

রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে বনানীকে একদিন বিকেলের দিকে পাওয়া গেল। আমাকে দেখে বনানী অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল. কিন্তু আমি একটা হেস্তনেস্ত না করে যাব না।

—বনু!

বনানী চোখ লাল করে বলল—ভদ্রভাবে কথা বলুন। আমার নাম বনানী।

আমি অবাক হয়ে বললাম—আমি কী দোষ করেছি?

বনানী গম্ভীর গলায় বলল—দোষগুণের আমি কিছু জানি না। আপনাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আপনার কথা মনে পড়লে আমার রাগে দাঁত কিড়মিড় করে। যান, আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কেটে পড়ুন।

তখনো হাল না ছেড়ে আমি বললাম—ছিঃ, রামনাথবাবুর মেয়ে হয়ে তোমার এই স্বভাব?

—কী আজেবাজে ফ্যাচফ্যাচ করছেন? বনানী ধমক দিয়ে উঠল—কে রামনাথবাবুর মেয়ে? রামনাথবাবু আমার কেউ নয়, তার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। তাকে ডাইভোর্স করে আমার মা নতুন বিয়ে করেছেন, আমার এখন নতুন বাবা।

—তোমার নতুন বাবার নামটি একবার শুনতে পারি?

—শুনুন। ভূপতি সরখেল।

আরেকটি শিশুর জন্ম

না. তিনটি নয়, ছুটি সন্তানই যথেষ্ট। কিন্তু ছু'টি সন্তানই একরকম হলে চলবে না. একটি ছেলে, আরেকটি মেয়ে হওয়া চাই। সুভদ্রার একটি মেয়ে আছে। ঈশ্বর করুন, সময় মতো যেন সুভদ্রার কোলে একটি ছেলে আসে।

এ-পর্যন্ত সুভদ্রার একটিমাত্র মেয়ে হয়েছে। সুভদ্রা মেয়েটির নাম রেখেছে—আইভি। আপনারা পাঁচজনে বিচার করে বলুন, মেয়েটির নাম সুভদ্রা পছন্দসই রেখেছে কিনা। মানতেই হবে, সুন্দর নাম। এই একটি ঘটনা থেকেই আপনারা সুভদ্রার রুচি আন্দাজ করে নিন। আন্দাজ করে দেখুন—সুন্দর রুচি।

হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হচ্ছে, এখন আর গয়ংগচ্ছের সময় নেই, আপিসে লেট হয়ে যাবে, সময় আর স্পেশ্যাল লেডিজ ট্রাম কারো জন্য অপেক্ষা করে না। জানলা দিয়ে এক পলক আকাশের দিকে তাকিয়ে নিল সুভদ্রা, বৃষ্টি হবে কী? এবেলা হয়তো না হতে পারে, কিন্তু আকাশের ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হচ্ছে, ওবেলা হুড়মুড় করে বৃষ্টি আসবে। তাহলে বেঁটে ছাতাটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো। সুন্দর ছাতা। ইণ্ডিয়ার ছাতা নয়, আবিসিনিয়ার ছাতা। কোম্পানি থেকে হেমন্ত একবার আবিসিনিয়া গিয়েছিল, বিয়ে হওয়ার আগের কথা, সেবার হেমন্ত আবিসিনিয়া থেকে সুভদ্রার জন্য এই ছাতাটি নিয়ে এসেছিল। সমস্ত আপিসে আর কারো আবিসিনিয়ার ছাতা নেই।

হেমন্ত নামটি খুব মডার্ন নয়। তা এ-বিষয়ে কেউ যেন সুভদ্রাকে দোষ না দেয়। স্বামীর নাম তো আর সুভদ্রা রাখেনি। শোনা যায় 'হেমন্ত' নামটি সুভদ্রার শাশুড়ি রেখেছিলেন। 'হেমন্ত' নামটি সুভদ্রার ভালো লাগে না, কিন্তু সেজন্য শাশুড়িকে সুভদ্রা রাগ করে

কখনো কোনো কটুকথা বলেনি। রাগ করবে কেন, একজন অশিক্ষিতা বৃদ্ধা মহিলার কাছে কত আর আশা করা যায়, যার যেমন রুচি। তাহলে শুনুন, শাশুড়ি আরেকটি জঘন্য কাণ্ড করে রেখেছেন, হেমন্তের একটি ডাকনামও রেখে দিয়েছেন, ডাকনামটি হচ্ছে—গদা। কী বিশ্রী, কী বিশ্রী। কিন্তু সকলেই জানে, সুভদ্রা কস্মিনকালেও স্বামীকে ডাকনাম ধরে 'গদা' বলে ডাকেনি, বরাবর 'হেমন্ত' বলে ডাক দিয়ে এসেছে।

ট্রামস্টপে এসে একবার হাতঘড়ি দেখল সুভদ্রা। ঠিক আছে, দেরি হয়নি। এখনি লেডিজ ট্রাম এসে পড়বে।

এল। উঠে পড়ল সুভদ্রা।

আইভিকে কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দেওয়া গেছে। আইভিকে নিয়ে আর বিশেষ কোনো ভাবনা নেই। ভাইফোঁটার দিন মেয়েটা বড়ো মুষড়ে থাকে। আইভির একটি ভাই থাকলে খুব ভালো হয়।

কিন্তু ঝট করে কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে নেই। সব কাজই বিবেচনা করে করতে হয়। ঝপ-ঝপ গণ্ডায়-গণ্ডায় ছেলে-পিলে হচ্ছে, সে-সব দিন আর নেই।

বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করে নিজের ছেলের নাম পছন্দ করে রেখেছে সুভদ্রা। সত্যজিৎ। চমৎকার নাম। ওটা ভালো নাম রইল তাছাড়া একটা ডাকনামও ভেবে রাখা আছে। ডালিম। ডালিমের ছ-মাস বয়স পর্যন্ত সুভদ্রা আপিস থেকে ছুটি নেবে ততদিন ছুটি না জমিয়ে ডালিমকে আনা চলবে না। আর হ্যাঁ, ভালো কথা, একটা দোলনা কিনতে হবে। দোলনা দোলাতে-দোলাতে সুভদ্রা ডালিমের সামনে বসে গুণগুণ করে গাইবে—আতাগাছে তোতাপাখি ডালিমগাছে মৌ···

সুভদ্রার সংসার দেখাশোনা করে মোক্ষদা। না, মোক্ষদা সুভদ্রার কোনো আত্মীয় নয়। মাইনে-করা মহিলা। কাজকর্মে খুব ওস্তাদ, সবদিকে নজর। নিজের মাইনের দিকে পর্যন্ত। বাচ্চার তদারকিতে আলাদা মেহনৎ লাগে, অতএব ডালিমের জন্য

মোক্ষদা নির্ঘাত বাড়তি মাইনে দাবি করবে। অন্তত দশ টাকা বাড়তি চাইবে। তা দেওয়া যাবে। দু-মাস বাদে সুভদ্রার একটা ইনক্রিমেণ্ট হচ্ছে, দশ টাকা দিতে অতএব গায়ে খুব লাগবে না।

আপিসে অতসীদি খুব ভাগ্যবতী মহিলা। অতসীদের একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে। আচ্ছা, এটা কি আপনা-আপনি হয়েছে, নাকি, মূলে কোনো কলাকৌশল আছে। এক ফাঁকে অতসীদির কাছ থেকে কথাটা জেনে নিতে হবে। অতসীদি খুব ভাল মেয়ে, যদি কোনো টোটকা-টাটকি থেকে থাকে তো অতসীদি গোপন করবে বলে মনে হয় না।

আপিসে এসে আরেকবার হাতঘড়ি দেখল সুভদ্রা। ঠিক আছে, দেরি হয়নি।

আজ আর কাজে মন বসছে না, অতসীদির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। কিন্তু উঁকি মেরে দেখা গেল, অতসীদি এখনো আসেননি। কস্মিনকালেও উনি সময়মতো আপিসে আসেন না, একদিন সেকথা বলতে গিয়ে সুভদ্রার যথেষ্ট অপমান হয়েছে। অতসীদি বলেছিলেন—তোমাদের আর কী ভাই, ঘরে তো আর ছেলে নেই, নিজের পেটের কচি ছেলে ঘরে থাকলে বুঝতে যে তার হাত ছাড়িয়ে টাইমলি আপিসে আসা অসম্ভব।

এতক্ষণে এলেন মহারাণী!

দু-চার মিনিট পরে সুভদ্রা চলে এল অতসীর কাছে। মুখে একপর্দা হাসি টেনে বলল—আজ যেন আপনি একটু আগে এসে গেছেন অতসীদি।

নিজের হাতঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে অতসী বলল—না, আগে আর হলো কোথায়, এইরকম সময়েই তো আসি রোজ। এমন দুষ্টু হয়েছে পিকলুটা যে আসতেই দিতে চায় না। আজ কী কাণ্ড করেছে জানো?

সুভদ্রা দু-চোখ এমন বড়ো করে ফেলল যেন ইহজন্মে কখনো

কোনো বাচ্চা ছেলের দুষ্টুমির কাণ্ড শোনেনি।

—কী কাণ্ড, অতসীদি ?

—সকালবেলা, ঘুম থেকে উঠে আমি তো বাথরুমে ঢুকেছি, পিকলু এদিকে করেছে কী আমার বালিশের তলা থেকে···

সুভদ্রা দু-চোখ আরো বড়ো করে বলল—ওম্ মা, ভীষণ দুষ্টু ছেলে তো। জানেন অতসীদি, আমার শাশুড়ির মুখে শুনেছি হেমন্তও ছেলেবেলায় ভীষণ দুষ্টু ছিল, ওর জ্বালায় আমার শাশুড়ির আমের আচার আর কুলের চাটনি রাখা দায় হতো। দারুণ দুরন্ত কিনা। সেইরকমই আছে এখনো, আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। এখন আবার একটা নতুন বায়না ধরেছে।

হেমন্তের বিষয়ে অতসীর কণামাত্র কৌতূহল নেই, কিন্তু কিছু না বললে নিতান্ত খারাপ দেখায়, তাই আলগোছে বলল—নতুন কী বায়না ধরেছে ?

কথাটা বলতে গিয়ে কানের ডগা ঈষৎ গরম হয়ে উঠল সুভদ্রার। বলল—একটা ছেলের বায়না ধরেছে। একটা ছেলে না থাকলে নাকি ঘর-সংসার অন্ধকার থাকে।

উদাস গলায় অতসী বলল—তোমার স্বামীর তারিফ করতে হয়, ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান আছে, উনি তো কোনো অন্যায় কথা বলেননি।

একটা ঢোক গিলে সুভদ্রা বলল—কিন্তু হেমন্তের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আমি বলি কী, আমাদের তো একটি মেয়ে আছে, তাই তো যথেষ্ট। আজকাল কি আর ছেলে-মেয়েতে কোনো তফাৎ আছে।

অতসী সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল—না, না, তোমার কথা একেবারেই ঠিক নয়। মুখে যে যাই বলুক, ছেলে আর মেয়েতে অনেক তফাৎ। মেয়ে তো খারাপ কিছু নয়। কিন্তু সঙ্গে একটি ছেলেও চাই। একগুঁয়েমি করো না সুভদ্রা, তুমি হেমন্তের কথামতো কাজ করে যাও।

একটা নিরুপায় ভঙ্গি করে সুভদ্রা বলল—কিন্তু আপনিই

বলুন অতসীদি, ছেলে যে হবেই এমন গ্যারান্টি কি কেউ দিতে পারে ?

খুব বিজ্ঞের মত অতসী বলল—না, গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না, কিন্তু প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে চললে ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। তুমি ডাক্তার গৌরীহরণ দত্তের নাম শুনেছ ?

—না তো।

—শুনে রাখো, কাজে লাগবে। ভবানীপুরে ডাক্তার গৌরীহরণ দত্তের নার্সিংহোম আছে। অদ্ভুত ডাক্তার। আজ পর্যন্ত গৌরীহরণ ডাক্তারের হাতে কোনো পোয়াতির মেয়ে হয়নি, সব ছেলে, সব ছেলে। আরে, বেশি কথা কী, আমাদের কণার ছেলেও তো সেখানে হয়েছে।

—আমাদের কণা ? জেনারেল সেকশনের কণা ?

—হ্যাঁ। তুমি জানো না ?

—না তো।—কণার কথা ভেবে মনে মনে খুব দুঃখ পেল সুভদ্রা। এত ভাব সুভদ্রার সঙ্গে, অথচ দ্যাখো, আসল কথাটা ঠিক চেপে গেছে। কী শয়তান, কী শয়তান।

যাক, অতসীদির কাছে যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে। বিদায়ের আগে অতসী আরেকপ্রস্থ উপদেশ দিল সুভদ্রাকে—একগুঁয়েমি করো না সুভদ্রা, তুমি হেমন্তের কথামতো কাজ করে যাও। স্বামীর সাধ-আহ্লাদ যে-সব মেয়ে পূর্ণ করে না, তুমি কেন তাদের মতো হবে ?

নিজের চেয়ারে এসে বসল সুভদ্রা।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি স্থির হয়ে বসতে পারল না। ডালিমের জন্য মন বড়ো অস্থির করছে।

আচ্ছা, ছুটি কতদিন জমেছে ? সে হিসেব না পেলে তো কিছুতেই কিছু হবার নয়। সে বিষয়ে একটা পাকা খবর যোগাড় করে আনা দরকার।

সেই মুহূর্তে উঠে পড়ল সুভদ্রা, চলল আডমিনিস্ট্রেশন সেকশনের দিকে।

নিরাপদবাবু নামে একজন কেরাণী এই আপিসে মেয়েদের ছুটিছাটার হিসেব রাখেন। তার কাছেই গিয়ে হাজির হলো সুভদ্রা। ঠিক যতখানি হাস্যমুখ দেখালে নিরাপদবাবু বিগলিত হবেন তত-খানি হাস্যমুখে সুভদ্রা বলল—আমার একটা উপকার করতে হবে নিরাপদবাবু।

সুভদ্রার অঙ্ক নির্ভুল। নিরাপদবাবু বিগলিত হলেন। বিগলিত হয়ে বললেন—আপনাদের উপকার করার জন্যই নিরাপদ হাঁজরার জন্ম। কী করতে হবে, আপনি বলে ফেলুন।

—আমার লীভ অ্যাকাউণ্ট দেখে ছুটির হিসেবটা দয়া করে একটু বলে দেবেন।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন নিরাপদ হাজরা, নিজেই আলমারি খুলে খুঁজে নিয়ে এলেন সুভদ্রার লীভ অ্যাকাউণ্ট। চোখের পলকে হিসেব কষে বলে দিলেন সুভদ্রার ছুটির হিসেব।

চলে আসতে আসতে সুভদ্রার মনে হলো তার রূপ-যৌবনের জেল্লা এখনো নিটুট আছে, এখনো বহুদিন হাজরার কাছ থেকে চোখের পলকে কাজ আদায় করা যাবে।

তা ছুটির হিসেব ভালোই পাওয়া গেল। সুভদ্রার ছুটির জন্য ডালিমের কোনো অসুবিধা হবে না।

এখন একবার জেনারেল সেকশনে যেতে হচ্ছে। গৌরীহরণ ডাক্তারের হাতে কণার ছেলে হয়েছে, হয়তো কণার কাছ থেকে আরো দু-একটা জরুরি কথা আদায় করা যাবে।

কণার কাছে গিয়ে বাজে কথায় সময় নষ্ট করল না সুভদ্রা। চোখের পলকে আসল কথায় এসে পড়ল।

সুভদ্রার সমস্ত শরীর একবার জরীপ করে নিল কণা। নীচু গলায় এমন একটা কথা বলল কণা যে সুভদ্রার কানের ডগা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। সুভদ্রা সরল গলায় বলল—না রে, এখনো সে-সব কিছু নয়। সমস্ত দিক হিসেব না করে আমি আর বাবা ওপথে যাচ্ছি না। আচ্ছা, তোর কি মনে হয় যে গৌরীহরণ ডাক্তারের হাতে···

—শুধু ডাক্তারের উপর নির্ভর করে আমি বসে থাকিনি। তোকে একটা অব্যর্থ রাস্তা বলে দিতে পারি, বিশ্বাস করলে অবশ্যি সুফল পাবি, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীতে কি তোর বিশ্বাস আছে ?

এমনিতে সাধু-সন্ন্যাসীতে সুভদ্রার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, কিন্তু ডালিমের জন্য সুভদ্রা সাধু-সন্ন্যাসীকেও বিশ্বাস করতে রাজি আছে। বাঃ, ডালিমের জন্য সুভদ্রা এটুকু করতে পারবে না ?

সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে কণা বলল—তাহলে আর দেরি করিস না, কালই তুই মদনানন্দ স্বামীজির কাছে চলে যা, উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

একটু কিন্তু-কিন্তু হয়ে সুভদ্রা জিজ্ঞেস করল—স্বামীজির কাছে কি আমি একলা যাব ?

কণা জিভ কেটে বলল—ছিঃ, স্বামীজি সেরকম চরিত্রের মানুষ নন। তুই হেমন্তবাবুর সঙ্গে স্বামীজির কাছে চলে যাবি। দুপুরের দিকে যাবি, তখন ভিড় কম থাকে।

—স্বামীজির ঠিকানা কী।

—ডোমজুড়। হাওড়া গিয়ে লাইট রেলে চেপে বসবি, একটানে ডোমজুড় চলে যাবি, সেখানে যাকে জিজ্ঞেস করবি, তোকে স্বামীজির আশ্রম দেখিয়ে দেবে।

আর দেরি করল না সুভদ্রা, পরদিনই আপিস কামাই করল, হেমন্তকেও আপিসে যেতে দিল না। দুপুরবেলা হেমন্তকে নিয়ে ডোমজুড় রওনা দিল। হেমন্ত কিছুই জানে না, হেমন্ত তো হতভম্ব। কেন এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সুভদ্রা কে জানে।

পথে যেতে-যেতে সুভদ্রার মনে হলো, হেমন্তকে অন্ধকারে রাখা উচিত নয়, আসল কথাটা এবার হেমন্তকে বলা যেতে পারে। হেমন্তকে বাদ দিয়ে তো কিছু হওয়ার উপায় নেই।

যেতে যেতে সুভদ্রা বলল—তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জানো।

হেমন্ত বলল—না।

—ডোমজুড়। মদনানন্দ স্বামীজির কাছে। কেন জানো?

—না।

—ডালিমের জন্য।

হেমন্ত অবাক হয়ে বলল—ডালিম আবার কে?

—আহা, ন্যাকা, কিছু জানে না যেন। ডালিম তো আমাদের ছেলেব নাম।

হেমন্ত অবাক হয়ে বলল—ডালিম? আমাদের ছেলে? তা আমাদের ছেলে কোথায়?

লজ্জায় দু-খানা গাল গোলাপী কবে সুভদ্রা বলল—হবে হবে। স্বামীজি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন। তুমি বাপু অল্পেই বড়ো অধৈর্য হয়ে পড়ো।

ডোমজুড় আর কতদূর। মদনানন্দ স্বামীজীব আশ্রমে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না।

পুত্রসন্তান চাই এই তো? খানিকক্ষণ মদনানন্দ স্বামীজি দু-জনের কররেখা দেখলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—কোনো চিন্তা নেই, সামান্য একটু কষ্ট করতে হবে বাবাজীকে, তাহলেই মনস্কামনা সিদ্ধ।

ধ্যানস্থ হলেন স্বামীজি। তাবপর তাকালেন হেমন্তের দিকে' বললেন—বাবাজী আগামী মাঘীপূর্ণিমায় সূর্যাস্তেব পব তোমাকে গঙ্গাস্নান কবতে হবে।

হেমন্ত বুঝতে পারল। বলল—আজ্ঞে, আমাদের বাড়ির কাছেই বুড়িগঙ্গা আছে, বিশেষ কোনো কষ্ট হবে না।

আঁৎকে উঠলেন স্বামীজি। বললেন—না, না, বুড়িগঙ্গার ধারে কাছে যাবে না, পুত্রার্থে গঙ্গাস্নান, বুড়িগঙ্গায় কোনো কাজ হবে না, তোমাকে একটু কষ্ট করে যুবতীগঙ্গায় গিয়ে স্নান করতে হবে। স্নানান্তে সিক্তবস্ত্রে পদব্রজে বাড়ি আসতে হবে।

মাঘীপূর্ণিমার সন্ধ্যাবেলার সেই দৃশ্যটি কল্পনা করে হেমন্ত বিশেষ পুলকিত হলো না। বলল—আজ্ঞে, নিউমোনিয়া হয়ে

যাবে না ?

—হতেও পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু পুত্রলাভ অনিবার্য। তবে সিক্তবস্ত্রে পদব্রজে বাড়ি আসার পথে তোমাকে আরেকটি কর্তব্য সারতে হবে।

জিজ্ঞাসু চোখে স্বামীজির মুখের দিকে তাকাল হেমন্ত।

স্বামীজি প্রসন্নহাস্যে বললেন—মাঘীপূর্ণিমার রাত্রে গঙ্গাস্নানান্তে সিক্তবস্ত্রে পদব্রজে বাড়ি আসার পথে তোমাকে পাঞ্জাবী দোকানে ঢুকে এক গ্লাস লস্যি খেয়ে নিতে হবে। কিন্তু সাবধান দু-গ্লাস লস্যি খেয়ে ফেলো না যেন।

মরিয়া হয়ে হেমন্ত জিজ্ঞেস করল—দু-গ্লাস লস্যি খেলে কী হবে ?

ক্ষমাসুন্দর হাস্যে স্বামীজি বললেন—যমজ পুত্র হবে। মা জননী, তুমি কি যমজপুত্র চাও ?

ঘাড় নেড়ে সুভদ্রা হেমন্তকে একটু শাসন করল—তুমি বড্ড বাজে বকো। এক গ্লাস লস্যি খাবে, দু-গ্লাস লস্যি খাবে না, ব্যস।

দেখতে দেখতে মাঘীপূর্ণিমা এসে গেল। সেদিন সুভদ্রা আপিসে গেল না, হেমন্তকেও আপিসে যেতে দিল না, আইভিকে পাঠিয়ে দিল মামাবাড়িতে। স্বামীজির নির্দেশ মনে আছে তো ?

সন্ধ্যার আগে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল হেমন্ত। দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে, কিন্তু সে-সব কথা ভাবলে তো চলবে না।

স্বামীজির নির্দেশ একবিন্দু অমান্য করল না হেমন্ত। হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে যখন ঘরে ফিরল, রাত নটা বেজে গেছে। আলো-টালো নিভল। তারপর, যান মশাই, 'আমি আর কিছু জানি না।

মাসকয়েক পরের কথা। হিসেব করে যথাসময়ে ছুটি নিয়েছে সুভদ্রা। ডেলিভারির আগে ছ-সপ্তাহ এবং ডেলিভারির পরে

ছ-সপ্তাহ পুরো মাইনের ছুটি পাওয়া যায়। সুভদ্রার হিসেবে ভুল হয়নি। এমন নির্ভুল হিসেব যে ঠিক ছ-সপ্তাহের মাথায় হেমন্তকে একদিন ট্যাক্সি ডাকতে হলো, সুভদ্রাকে দিয়ে আসতে হলো ডাক্তার গৌরীহরণ দত্তের নার্সিংহোমে।

নীচের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল হেমন্ত।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, সহাস্যে নেমে এলেন ডাক্তার গৌরীহরণ। হেমন্তকে অভিনন্দন জানালেন। বললেন—আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। আপনার জন্য এতদিনে আমার একটা দুর্নাম ঘুচল।

—আজ্ঞে?

—সকলে দুর্নাম করত, গৌরীহরণ ডাক্তারের হাতে কেবল ছেলে হয়, মেয়ে হয় না। আমার হাতে এইমাত্র আপনার মেয়ে হয়েছে, সাড়ে ছ'পাউণ্ড। আর কেউ আমার দুর্নাম করতে পারবে না। আনন্দ করুন, আনন্দ করুন। চিয়ারিও।

মচ্‌মচ্‌ করে আবার উপরে উঠে গেলেন গৌরীহরণ ডাক্তার। আর হেমন্ত দু-চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। হেমন্ত না হয় কোনোগতিকে সামলে নেবে কিন্তু সুভদ্রা, সুভদ্রার কী হবে? সুভদ্রার সঙ্গে এখন কি একবার দেখা করা যায় না?

না। সিস্টার বলে দিলেন—কাল বিকেলে আসবেন, তার আগে আর দেখা হবে না।

পরদিন বিকেলে হেমন্ত ম্লান মুখে সুভদ্রার বেডের পাশে একটা টুলে এসে বসল। কিন্তু সুভদ্রা চোখ বন্ধ করে আছে। আচ্ছা, হেমন্তের কী দোষ?

চোখ বন্ধ রেখে সুভদ্রা গাঢ় গলায় বলল—তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেন?

আশ্চর্য, কবে কোথায় কখন হেমন্ত সুভদ্রার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে!

গলা তেতো করে সুভদ্রা বলল—লজ্জা করে না? আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নিউমোনিয়ার ভয়ে তুমি মাঘীপূর্ণিমার রাত্রে

লস্যি খাওনি। কাওয়ার্ড।

একটিও কথা না বলে হেমন্ত ভাবল, ভুল হয়ে গেছে, দারুণ ভুল হয়ে গেছে, লস্যির ক্যাসমেমো চেয়ে নিয়ে পকেটে রাখলে আজ একটা অকাট্য প্রমাণ দাখিল করা যেত, প্রমাণ করা যেত যে হেমন্ত কাওয়ার্ড নয়।

—না, তুমি কাওয়ার্ড, তোমার সঙ্গে আমি আর একটি কথাও বলব না।—একবারও চোখ না মেলে সুভদ্রা বলল—আমি পরিবার পরিকল্পনা মানি না, সরকারী বিজ্ঞাপনের পরোয়া করি না, যতদিন আমার ডালিম না আসে ততদিন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা।

—

মাছ

মাঘী সপ্তমীর দিন বরিশালের লোক মাছ-টাছ খায় না, নিরামিষ খেয়ে থাকে। জীবনে যদিও বিনতা কখনো বরিশাল যায়নি, তা না যাক, বাড়িতে বরিশালের কড়া নিয়ম, মাঘী সপ্তমীর দিন বিনতা মাছ খেতে পায় না। বছরে ওই একটি দিন বিনতার খুব দুঃখে কাটে।

লেকে, যেখানে বসলে বড়ো-বড়ো মাছের লীলাখেলা দেখা যায়, মাঘী সপ্তমীর দিন বিকেলবেলা সেখানে বসে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে গল্প করছিল বিনতা। মাঘী সপ্তমীর বিকেল, লেকের ধারে যথেষ্ট ঠাণ্ডা, জায়গাটায় রীতিমত সর্দি-কাশির ভয় আছে, কিন্তু আশা করি একথা সকলেই মানবেন যে, সর্দি-কাশির ভয় করলে প্রেমিক-প্রেমিকার চলে না।

মাঘী সপ্তমীর দিন বিনতার কী কষ্টে কাটে, পূর্ণেন্দুর তা অজানা নয়। অথচ পূর্ণেন্দু নিরুপায়। একটা কিছু উপায় বের করতে পারলে বড়ো ভালো হতো। পূর্ণেন্দু রাগ করে বলল—আচ্ছা বিনু, তুমিই বলো, এই কুসংস্কারের কোনো অর্থ হয়? মাঘী সপ্তমীর দিন মাছ খেতে নেই কেন?

—কেন খেতে নেই, আমি জানি না। শুনেছি শাস্ত্রে বারণ আছে। গোঁড়া বামুন-পণ্ডিত বংশের মেয়ে হয়ে আমি শাস্ত্র অমান্য করতে পারব না।

অস্বীকার করা যায় না, বিনতার এই গোঁড়ামিটুকু পূর্ণেন্দুর চমৎকার লাগে। অনেক বিষয়েই বিনতার অনেক কড়াকড়ি আছে। আজকালকার মেয়ে হয়েও বিনতা ঠিক আজকালকার মেয়েদের মতো নয়। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে প্রেম চলছে বহুকাল ধরে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, বিনতার সঙ্গে সিনেমা দেখা ছাড়া আর কোনো

দুঃসাহসের কাজ পূর্ণেন্দু আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি। তাও হিন্দী নয়, বাংলা সিনেমা। বিনতাকে কেবলমাত্র একদিন ইংরেজি সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল পূর্ণেন্দু, কিন্তু ওই একদিনই। পূর্ণেন্দুকে ধমক দিয়ে বিনতা বলেছিল—ছিঃ, এ-সব বাজে সিনেমায় তুমি আমাকে আর কক্ষনো নিয়ে আসবে না। মা গো, কী ঘেন্না, মেমসাহেবরা যে এরকম অসভ্য হয় কেমন করে, কে জানে।

পূর্ণেন্দু চুপ। এবং সেদিন থেকে দারুণ সতর্ক হয়ে গেছে। বিনতাকে নিয়ে পারতপক্ষে আর সিনেমার দিকে যায় না, গেলেও যায় পৌরাণিক সিনেমায়, কিংবা সাধুসন্তদের জীবনকাহিনী দেখতে।

সিনেমা-থিয়েটার নয়, গান-বাজনা নয়, সাজসজ্জা নয়, সন্দেশ-রসগোল্লা নয়—বিনতার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে মাছ আর মাছের গল্প। সমস্ত মাছের নাম-ঠিকানা বিনতার মুখস্থ। ইলিশ, খলসে, শোল, রুই, ভেটকি। চাঁদা, চেলা, বাচা, চিংড়ি, মৃগেল, বোয়াল। তপসী, বাতাসী, কই, মাগুর, কাতল। ভেউস, বাউস, পুঁটি, জিওল, চিতল।

শুনে-শুনে বিস্তর মাছের নাম-ধাম পূর্ণেন্দুর পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গেছে। কান ঝালাপালা হয়ে গেছে পূর্ণেন্দুর, কিন্তু বিনতার উৎসাহ কিছুমাত্র কমেনি, একেক সময় পূর্ণেন্দুর সন্দেহ হয় হয়তো মাছের মহিমা শুনতে শুনতেই তাকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে।

হঠাৎ অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ গেল বিনতার। ঝকমক করছে কালপুরুষ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ কালপুরুষের দিকে তাকিয়ে রইল বিনতা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পূর্ণেন্দুকে বলল—দ্যাখো, দ্যাখো কী সুন্দর, কী রকম তেজস্বী দেখাচ্ছে কালপুরুষকে।

খুশি হয়ে পূর্ণেন্দুও একবার কালপুরুষকে দেখে নিল।

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনতা বলল—কালপুরুষের মতো অবিকল এইরকম সুন্দর তেজস্বী চেহারার একটা বিশাল কাতল মাছ দেখেছিলাম একবার গড়িয়াহাট বাজারে। জীবনে কখনো

তাকে ভুলব না।

মানুষের তো কতরকম স্বপ্ন থাকে, কিন্তু বিনতা স্বপ্নেও আজ পর্যন্ত মাছ ছাড়া অন্য কিছু দেখেনি। নর্থ-সীতে সার্ডিন মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্বপ্ন দেখে আধোঘুমে পাশ ফিবে শুতেই আরেকটি লোভনীয় স্বপ্ন—বঙ্গোপসাগর আলো করে আছে অতিকায় চিংড়ির ঝাঁক।

বিনতা একদিন পূর্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করল—রোজ নয়, একেক দিন মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়, দারুণ মাছ খেতে ইচ্ছে করে, মনে হয় একটু মাছ খেতে না পেলে তক্ষুনি মরে যাব। তখন আমি কী করি বলো তো?

কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না পূর্ণেন্দু। সত্যি এমতাবস্থায় একজন বামুনপণ্ডিত বংশের মেয়ের পক্ষে কী করা সম্ভব। ভেবেচিন্তে কূলকিনারা না পেয়ে পূর্ণেন্দু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল—আমি ভেবে পেলাম না, তুমিই বলো, আমি শুনে যাই।

বিনতা সহাস্যে বলল—হেরে গেলে তো, আচ্ছা শোনো—আমার ঘরের আলমারিতে সব সময় এক কৌটো সার্ডিন মাছ থাকে, দায়-আদায়ের কথা তো বলা যায় না, কয়েকটা সার্ডিন মাছ খেয়ে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, মনে আর কোনো দুঃখ থাকে না।

সবই ঠিক হয়ে আছে, কিন্তু বিয়ের দিন-তারিখেব কথা পূর্ণেন্দু কিছুতেই পাকা করে ফেলতে পারছে না। এবং হলপ করে বলা যায়, দোষ পূর্ণেন্দুর নয়। মাছের কথায় সব সময় বিভোর হয়ে থাকে বিনতা, দু-একটা বিয়ের কথা হতে-না-হতেই মধ্যিখানে বিনতা এমনভাবে মাছের নাম জপ করতে আরম্ভ করে যে, আসল কথাটা আর পাকা হয় না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন হলো। কীভাবে হলো সে বর্ণনা দেব না, দিতে পারব না। সে-সব বর্ণনা দিতে হলে গল্প আর আরম্ভ করা যাবে না এবং শেষও করা যাবে না। অতএব এই জায়গাটুকু সিনেমার টেকনিকে পার হয়ে যেতে হচ্ছে, অপরাধ ক্ষমা করবেন। শাস্ত্রমতে সানাই বাজল, পূর্ণেন্দু আর বিনতার বিয়ে হলো, ফুলশয্যা

নৃত্যাদি হয়ে গেল। কাট।

রাত্তিরে ঘরের দরজা দিতে গিয়ে পূর্ণেন্দু দেখল, বিছানায় একটা হৃষ্টপুষ্ট বেড়াল। এবং বিনতা বেড়ালটাকে সাংঘাতিক আদর করছে। দরজায় খিল না দিয়ে পূর্ণেন্দু বলল—কী আশ্চর্য আমাদের বিছানায় সারা রাত্তির একটা বেড়াল থাকবে নাকি ?

—বাঃ, মিনি তো বরাবর আমার সঙ্গে শোয়। এ-ক'দিন বিয়ের হাঙ্গামা বলে ওকে আনিনি, এখন তো আর কোনো হাঙ্গামা নেই, ও আমাদের সঙ্গেই শোবে।

পূর্ণেন্দু বিহ্বল গলায় বলল—আমাদের সঙ্গেই শোবে ?

—আমাদের সঙ্গে না শুলে ও কি আস্তাকুঁড়ে গিয়ে শোবে ? সে আমি প্রাণে ধরে হতে দিতে পারব না, নারে মিনি মিনি মিনি বলতে-বলতে বিনতা ঝপ করে বেড়ালটাকে একটা চুমু খেয়ে ফেলল। চুমুটা এমন সুন্দর করে খেল যে, পূর্ণেন্দুর বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল, তার জিভে জল এসে গেল।

অগত্যা পূর্ণেন্দুকে দরজায় খিল দিতে হলো, আলো নেভাতে হলো। বিনতা মিনিকে আদর করে শোয়ালো দু'জনের মধ্যিখানে। রাগে-দুঃখে পূর্ণেন্দু আবার বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বেলে দিল, আর বিনতা সর্বহারার মতো বলে উঠল—আলো নেভাও, আলো নেভাও, নইলে মিনির ঘুম হবে না।

মানুষ কত আর সহ্য করতে পারে, পূর্ণেন্দু কড়া গলায় বলল—তোমার মিনিকে তোমার ও-পাশে না সরালে আমি কিছুতেই আলো নেভাব না।

—বাব্বাঃ, বাবুর কী রাগ, অবোলা জীবের ওপর একবিন্দু দয়ামায়া নেই। সরাচ্ছি বাপু সরাচ্ছি। আয় রে মিনি, আমার এদিকে এসে শো।

শেষ পর্যন্ত মিনিকেও সহ্য করে নিতে হলো। পদ্যে আছে, মহীতে দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ হয় না। দুঃখ সহ্য করার ফলে পূর্ণেন্দুর অবশ্যই কিছু কিছু সুখলাভ হচ্ছে।

মোটের উপর, দিনরাত সুখে-স্বচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছে।

আর মাছ, মাছ, মাছ। বাড়িতে মাছের মহোৎসব লাগিয়ে দিয়েছে পূর্ণেন্দু। কে কত মাছ খেতে পারে দেখা যাক। পূর্ণেন্দুর মনের মধ্যে এইরকম একটি ক্ষীণ আশা যে বিনতাই একদিন বিরক্ত হয়ে বলবে—দিনকয়েক আর মাছ-টাছ এনো না, মাছে আমার অরুচি হয়ে গেছে।

বৃথা আশা।

পূর্ণেন্দু মা-বাবার একমাত্র সন্তান। পূর্ণেন্দুর বাবা বরং একদিন মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন—এত মাছ কি ভালো? শেষকালে একটা অসুখ-বিসুখ না হয়।

পূর্ণেন্দুর মাও বললেন—হ্যাঁ, শেষকালে একটা অসুখ-বিসুখ না হয়।

কিন্তু বিনতা হাসিমুখে বলল—না, মাছ খেয়ে কখনো অসুখ-বিসুখ করে না। বরং প্রাণ ভরে মাছ খেলে অসুখ-বিসুখ সেরে যায়।

আর কথা কি, পূর্ণেন্দু বাজার উজাড় করে মাছ আনতে লাগল বাড়িতে। বামুন-পণ্ডিত বংশের মেয়ে বিনতার মাছে অরুচি নেই, ক্লান্তি নেই।

একদিন রাত্রে বিনতা পূর্ণেন্দুকে বলল—রোজ রোজ এরকম ভালো লাগে না।

উৎসাহিত হয়ে পূর্ণেন্দু বলল—তাহলে কি কাল থেকে মাছ কমিয়ে দেব?

—না, না, না। মাছ তো আনবেই। মাছ ভালো লাগবে না কেন, রোজ রোজ একরকম ঝোল, ভাজা ভালো লাগে না। কাল থেকে ভাবছি মাছের নতুন নতুন প্রিপারেশন করব।

নতুন-নতুন প্রিপারেশনও জানো নাকি?

—বাঃ, তুমি আমাকে কী ভাবো। কত নতুন নতুন কায়দায় মাছ রান্না করব, খেলে ভুলতে পারবে না। রুই মাছের ইংলিশ-কারী, গলদা চিংড়ির কোপ্তাকারী, বাগদা চিংড়ির মালাইকারী,

কাতলা মাছের রমনজুষ, তপসে মাছের ইংলিশরোষ্ট।

চোখ গোল গোল করে পূর্ণেন্দু বলল—বাপরে বাপ, তুমি এত জানো?

—মশাই, আমাকে তুমি ভেবেছ কী। আরো অনেক আছে। গুলীকাবাব, দমপোক্তা, মাহীকোপ্তা, মাছের চমচম—মাছ দিয়ে কী না করা যায়। মাছের চমচম করতে কী কী জিনিস লাগে বলো দেখি।

জীবনে পূর্ণেন্দু কখনো মাছের চমচমের নাম শোনেনি। এ-প্রশ্নের জবাব পূর্ণেন্দুর অসাধ্য।

বিনতা হাততালি দিয়ে বলে উঠল—ফেল, ফেল। তুমি কিচ্ছু জানো না। মাছের চমচম করতে লাগবে ঘি, ছোলার বেসম, গরম মশলা, লঙ্কা, ধনে, জাফরাণ, ছোটো এলাচ, বাদাম বাটা, দই, নুন। কেমন করে মাছের চমচম বানায়, জানো?

পূর্ণেন্দু ঘাড় নাড়ল—না।

খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনতা বক্তৃতা আরম্ভ করল—এক কিলো আন্দাজ একটা রুই মাছকে আঁশ-টাশ ছাড়িয়ে ধুয়ে নিতে হবে; তারপর মাছটার গায়ে এক আঙুল পুরু মাটির প্রলেপ লাগিয়ে গরম বালির মধ্যে রেখে দিতে হবে। উপরের মাটি লাল হয়ে এলে মাছটাকে বালির ভেতর থেকে বের করে এনে গরম জলে ভালো করে ধুতে হবে, কাঁটা-টাটা ফেলে দিয়ে গরম মশলার গুঁড়ো আর বেসম দিয়ে মাছটাকে ঠেসে মাখতে হবে, তারপর ছোটো ছোটো চমচমের মতো গড়তে হবে। হাঁড়িতে জল চাপিয়ে খড় বিছিয়ে নিতে হবে, মাছের চমচমগুলো খড়ের উপর রেখে জাল দিতে হবে।

পূর্ণেন্দু ক্লান্ত হয়ে বলল—আর বলতে হবে না, বুঝেছি।

—কিচ্ছু বোঝোনি, শেষ পর্যন্ত শোনো। চমচমগুলো শক্ত হয়ে এলে নামিয়ে ছোটো এলাচের ফোড়ন দিয়ে ঘিতে ভাজতে হবে। চমচমের রঙ যখন বাদামী হয়ে আসবে, তখন ধনেবাটা, লঙ্কাবাটা, লবণ গুলে ঢেলে দিতে হবে। তারপর সুসিদ্ধ হলে

বাদামবাটা, দই, জাফরাণ আর গরম মশলার গুড়ো দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। ব্যস, হয়ে গেল।

এতক্ষণে পূর্ণেন্দু একটা কথা বলার সুযোগ পেল—তারপর খেতে হবে, এই তো ?

বিনতা হাসিমুখে বলল—তা না হলে আর কষ্ট করে রান্না কেন। মাছের চমচম শুনেই তোমার বাক্য হয়ে গেল। তাহলে সাহী কোপ্তার কথা শুনলে তো তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। আচ্ছা, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি একটু পরীক্ষা করে দেখি। বলো তো, সাহী-কোপ্তা কেমন করে বানায় ?

পূর্ণেন্দুকে কিছু বলতে হলো না, বিনতা ঘাড় দুলিয়ে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি কিচ্ছু জানো না। আচ্ছা, খুব সংক্ষেপে তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। ধুয়ে কুটে মাছে আদার রস আর নুন মাখাও, আধ পো ঘিতে কিছু লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে ভেজে নাও। তারপর আদা মরিচ লঙ্কা পেঁয়াজ বাটা কালজিরে ও নুন জলে গুলে ঢেলে দাও, নেড়ে-চেড়ে হাঁড়ির মুখ ঢেকে রাখো। জল মরুক, মাছ সেদ্ধ হোক।

পূর্ণেন্দু হাতজোড় করে বলল—হোক। আজ আর থাক। এক রাত্রে এত বিদ্যে হজম করতে পারব না।

বিনতা পূর্ণেন্দুর কথা উড়িয়ে দিল—ইস, এত সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তবু বলে কিনা পারবে না। একটু মন দিয়ে শোনো, তাহলেই পারবে। একবারে যদি না পারো তো আবার বুঝিয়ে দেবো, আমি আছি কিসের জন্য। শোনো, যা বলছিলাম।

অফুরন্ত উৎসাহে বিনতা বলে যেতে লাগল—তারপর এক ছটাক ঘিতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়ে মাছে ঢেলে দাও, নেড়েচেড়ে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে নামাও। ঠাণ্ডা হলে মাছের কাঁটা বেছে নাও, ওর সঙ্গে মেশাও দই, কাঁচা মুগডাল বাটা, ছাতু, মৌরীর গুঁড়ো, পোস্তবীজ আর ডিম। তারপর ডিমের মতো গড়ন করো। একটা পাত্রে ঘি ঢালো, মাছগুলো সাজাও, ভালো

করে ঢেকে দাও পাত্রের মুখে, তারপর পাত্রের উপরে—নীচে কাঠকয়লা দিয়ে রাখো। এবার নামিয়ে নেবার সময় হলো।

পূর্ণেন্দুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল—বাঁচা গেল।

—কিন্তু ঠিক কখন নামাবে বলো দেখি?

পূর্ণেন্দু নিস্তেজ গলায় বলল—আর দগ্ধে মেরো না, লক্ষ্মীটি। তুমি দয়া করে বলে দাও, ঠিক কখন নামাব।

ডান হাতের একটা আঙুল তুলে বিনতা বলল—ঠিক যখন চুড়চুড় শব্দ বেরবে। সাহীকোপ্তায় এই চুড়চুড় শব্দটাই আসল। চুড়চুড়ের আগে কিংবা পরে নামালে চুড়চুড়ের আর জাতজন্ম থাকবে না।

—বুঝেছি। একেবারে জলের মতো সোজা। কিন্তু ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, এত মাছের কথা তোমার মনে থাকে কেমন করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনতা বলল—আমার স্মৃতিশক্তি ভী-ষ-ণ দুর্বল। বলতে গেলে, কিছুই মনে থাকে না। দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

চট করে আলমারী খুলে ফেলল বিনতা। চোখের পলকে বের করে আনল একখানা খাতা। গানের খাতা নয়, মাছ রান্নার খাতা। খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিনতা বলল—জানো, কত চেষ্টা করেছি, নুরজাহানী কাবাব আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। অমন চমৎকার জিনিস, খাতায় যত্ন করে লিখে রেখেছি, একটু শুনে দেখো, কী সুন্দর।

—আজ রাত্রে কী নুরজাহানী কাবাব না শুনলেই চলবে না?

বিনতার মুখ থমথমে হয়ে উঠল—এত কষ্ট করে খাতাখানা বের করে আনলাম, তুমি অন্তত নুরজাহানী কাবাবটা শুনবে না?

নিরুপায় হয়ে পূর্ণেন্দু বলল—পড়ো। শুনি।

—না। আমি ভালো পড়তে পারি না। —তুমি পড়ো, আমি শুনি। চমৎকার হবে, তুমি তো খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারো। তোমার গলায় নুরজাহানী কাবাব অদ্ভুত

শোনাবে। নাও, পড়ো। কবিতার মতো বেশ আবেগ দিয়ে পড়তে হবে কিন্তু।

পূর্ণেন্দু বিনতার খাতা দেখে গদগদ গলায় নুরজাহানী কাবাবের রন্ধনপ্রণালী পড়ে যেতে লাগল—একটি বৃহৎ মৎস্যের আঁইস ও পোঁটা ফেলিয়া, এক ছটাক বেসম জলে গুলিয়া, অখণ্ড মৎস্যটি বেশ করিয়া ধুইবে। পরে মৎস্যটির সর্বাঙ্গে একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়াইয়া, তদুপরি এক অঙ্গুলি পুরু মাটির লেপ দিবে। তৎপরে একটি কড়ায় বালুকা অর্ধপূর্ণ করতঃ তাহার উপর মৎস্য রাখিয়া, উহা পুনরায় বালুকা দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। শেষে এই কড়াটি জ্বালে চড়াইবে। জ্বালে বালুকা লাল হইয়া উঠিলে মৎস্যটি বাহির করিয়া মাটি ফেলিয়া পরিষ্কার করিবে। পরিষ্কৃত হইলে উহার কাঁটা ফেলিয়া মৎস্য বাহির করিয়া লইবে। অনন্তর কুমকুম ও ঘৃত ব্যতীত ডিমের তরলাংশ, সমস্ত প্রকার মশলাবাটা ও অন্যান্য দ্রব্য, বাছা মাছের সহিত মিশাইয়া রাখিবে। পরে ইহা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিবে।

এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না, দম নেবার জন্য পূর্ণেন্দু একটু থামল। আর বিনতা মুগ্ধ হয়ে বলল—আঃ, কী সুন্দর পড়া তোমার।

হঠাৎ মিনির কথা মনে পড়ে গেল পূর্ণেন্দুর। জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, তোমার মিনিকে দিন কয়েক ধরে বিছানায় দেখছি না কেন?

লজ্জায় মুখ নীচু করে বিনতা বলল—সে এক কাণ্ড। তোমাদের পাশের বাড়ির হুলোর সঙ্গে মিনির বেজায় ভাব হয়ে গেছে, এখন আর মিনি রাত্তিরে আমার কাছে শুতে আসে না। কী অসভ্য রে বাবা!

—মিনির সঙ্গে হুলোর বিয়ে হয়ে গেছে ধরে নাও, তাহলেই আর কোনো গোলমাল থাকে না।

—কোনো অধর্ম হবে না তাতে?

—না, বরং সেটাই ধর্ম।

—যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। এবার তুমি নুরজাহানী কাবাবের বাকিটা পড়ো।

আবার পড়তে লাগল পূর্ণেন্দু—তৎপরে একটি হাঁড়িতে জল পুরিয়া, তদুপরি খড় পাতিয়া তাহাতে খণ্ডিত মৎস্য স্থাপন করতঃ হাঁড়িটি জ্বালে চাপাইবে। জ্বালে কিছুক্ষণ থাকিলে মৎস্য কঠিনত্ব-প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে পাক-পাত্রে সমস্ত ঘৃত পাকাইয়া, মৎস্য অর্ধভাজার মত করিয়া কুমকুম ছড়াইয়া দিয়া নামাইবে। এই প্রকারে মৎস্যের নুরজাহানী কাবাব……

হঠাৎ খাতা বন্ধ করে বুকে হাত চেপে শুয়ে পড়ল পূর্ণেন্দু, ছটফট করতে লাগল, অসহ্য যন্ত্রণা। বিনতা ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল পূর্ণেন্দুর মা-বাবাকে। এ-বাড়িতে হেমাঙ্গিনী নামে একজন বয়স্কা কাজকর্ম করে, থাকে, সেও ছুটে এল।

ডাক্তার ডেকে আনতে হলো। খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে তিনি মুখ গম্ভীর করলেন। বললেন—ভালো মনে হচ্ছে না। হার্টের ব্যথা। কার্ডিয়াক ইনসাফিয়েন্সি। যা হোক, অষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, কতদূর কী হবে বলা যায় না।

ডাক্তার বিদায় নিলেন। সকলের সামনে পূর্ণেন্দু বিনতার হাত জড়িয়ে বলল—বুঝেছি, আমার আর আশা নেই। কিন্তু রিনু, তোমাকে আমার শেষ আদেশ, বিধবা হলেও তুমি মাছ খাবে, তুমি মাছ না খেলে আমি পরলোকে গিয়েও শান্তি পাব না।

উপুড় হয়ে ভেঙে পড়ল বিনতা—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, অমন সব্বনেশে কথা তুমি মুখে এনো না, বামুনপণ্ডিত বংশের মেয়ে আমি, বিধবা হয়ে কিছুতেই আমি মাছ খেতে পারব না, পারব না, পারব না…

জড়িত গলায় পূর্ণেন্দু বলল—তোমাকে আমার শেষ আদেশ, বিধবা হলেও তুমি মাছ খাবে, তুমি মাছ খাবে, তুমি মাছ, মাছ, মাছ……

আর কিছু বলতে পারল না পূর্ণেন্দু। ওষুধ খাবারও সুযোগ পেল না। মারা গেল।

ঈষৎ অবান্তর হলেও এখানে বলা যেতে পারে পরদিনই পাশের বাড়ির হুলো বেড়ালটি রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে মরল। বাড়ির সকলেই প্রায় নিঃশব্দে কাঁদছে, মিনির একটানা আর্তনাদে সমস্ত বাড়ি আরো বেশী শোককরুণ হয়ে উঠল। এবং হুলোর মৃত্যুর পর, আশ্চর্য কাণ্ড, মিনি শুধু দুধভাত খায়, আর কিছু খায় না।

পূর্ণেন্দুর লাইফ-ইনসিওরেন্সের টাকা পেতে খুব বেশী সময় লাগল না। গ্র্যাচুইটি আর প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল। অত টাকা ঘরে রাখা ঠিক নয়, সব টাকা বিনতার নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে গেল।

দিন কয়েক পর পূর্ণেন্দুর বাবা বললেন—বৌমা ভেবেছিলাম, এই বাড়িতেই জীবন কাটবে। কিন্তু এ-বাড়িতে আর প্রাণ টিকছে না। আমি ঠিক করেছি, সামনের সপ্তাহেই তোমার শাশুড়িকে নিয়ে কাশী চলে যাব, কলকাতায় আর ফিরব না, যে-কদিন আছি বিশ্বেশ্বরের চরণেই থাকব দু'জনে। তুমি ?

চোখের জলে আকুল হয়ে বিনতা বলল—আমি কোথাও যাব না, বাবা। যে-কদিন আছি, এই বাড়িতেই থাকব।

বিনতাকে আশীর্বাদ করে পূর্ণেন্দুর বাবা বললেন—তাই থাকো মা, তাই থাকো, যাতে তোমার প্রাণ জুড়োয়।

বাড়িখানা বিনতার নামে লেখাপড়া করে দিয়ে গেলেন পূর্ণেন্দুর বাবা। যাবার আগে বিনতাকে বললেন—মা, খোকার শেষ আদেশ, আর আমার আদেশ শোনো, কোনো অন্যায় হবে না, তুমি মাছ খাও, তুমি মাছ খেলে কোনো দোষ হবে না।

শ্বশুরের পায়ের উপর বিনতার চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়ল। শান্ত গলায় বিনতা বলল—আমাকে ক্ষমা করুন, বাবা। বামুনপণ্ডিতবংশের মেয়ে হয়ে আমি অধর্ম করতে পারব না।

স্ত্রীকে নিয়ে পূর্ণেন্দুর বাবা চলে এলেন কাশীতে। গঙ্গার ধারে বাসা নিলেন। এবং আড়াই মাস বাদে বিনতার একখানা চিঠি পেলেন :

শ্রীচরণেষু,

বিবেচনা করে দেখলাম, আপনার পুত্রের শেষ আদেশ এবং আপনার আদেশ আমার অমান্য করা উচিত নয়। অথচ বামুন-পণ্ডিত বংশের মেয়ে হয়ে অধর্ম করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই অবস্থায় নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমি আবার বিবাহ করেছি। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধি আছে।

শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলে আমি আমার নতুন স্বামীর নাম লিখতে পারছি না। এই পর্যন্ত বলতে পারি; তিনি সৎস্বভাব, দেবদ্বিজে তাঁর অবিচল ভক্তি আছে।

আজকাল দু-বেলা মাছ খাচ্ছি। প্রচুর মাছ। যে-কদিন আছি, এই বাড়িতেই থাকব। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

নিয়তস্নেহধন্যা

বিনতা

পুনশ্চঃ—মিনিকে নিয়ে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। এখনো মিনি সারাক্ষণ বাড়িময় আর্তনাদ করে বেড়ায় এবং মাছ খায় না।

গঙ্গার ধার ও অধীর ভটচায

সওয়া ছটো। মিস্ মৃত্বলা মিত্র হাই তুলতে তুলতে বড়বাবুর টেবিলের সামনে এসে বললেন—আমি কিন্তু ঘড়িতে তিনটে বাজলেই আজ চলে যাব। জরুরী কাজ আছে।

বড়বাবুর নাম অধীর ভটচায। খুব কড়া বড়বাবু। অন্য কোনো কেরানি অধীর ভটচাযকে একথা বলতে সাহস করত না, কিন্তু মিস্ মৃত্বলা মিত্রের কথা আলাদা।

কথাটা আরেকটু খোলাখুলি বলা ভালো।

ঘোষসাহেব অধীর ভটচাযের উপরওয়ালা, অধীর ভটচাযের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনি বিরূপ হলে অধীর ভটচাযকে এক কথায় কলকাতা থেকে তাড়াতে পাবেন, ট্রান্সফার করে দিতে পাবেন দিল্লীতে কি বোম্বাইয়ে অথবা বিশাখাপত্তমে। ঘোষসাহেবের কলমের একটি খোঁচায় অধীর ভটচাযের সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে।

অফিসসুদ্ধ সকলে জানে ঘোষসাহেব ব্যাচেলর এবং মিস্ মৃত্বলা মিত্রকে তিনি বিশেষ স্নেহ করেন। আরো কিছু করেন কিনা কে জানে। সে-বিষয়ে যথেষ্ট কানাঘুষো হয়ে থাকে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু উচ্চারণ করবে কার এত সাহস।

অধীর ভটচায ব্যাকুল হয়ে মিস্ মৃত্বলা মিত্রকে বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। জরুরী কাজ আছে যখন, যাবেন বৈকি। কিন্তু আপিসের কোনো জরুরী কাজ কি আপনার টেবিলে পড়ে আছে?

—আছে। গোটা তিনেক আর্জেন্ট কেস আছে।

—ও। তা একটা কাজ করুন……

মিস্ মৃত্বলা মিত্র বললেন—আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

সে-সব কাগজপত্তর আমি আপনার টেবিলে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি নিজে দেখেশুনে করে নেবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে অধীর ভটচায বললেন—নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমি বেঁচে থাকতে আপিসের কাজকর্ম নিয়ে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। ও-সব আমি ঠিকঠাক চালিয়ে নেব।

এক গাদা কাগজপত্তর অধীর ভটচাযের টেবিলে এনে ফেললেন মিস্ মৃদুলা মিত্র।

সব কাজ এখন অধীর ভটচাযকে নিজের হাতে করতে হবে। উপায় কি, মিস্ মৃদুলা মিত্রের যে খুব জরুরী কাজ আছে, ঘড়িতে তিনটে বাজলেই যে তাকে চলে যেতে হবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই অধীর ভটচায মনে মনে মিস্ মৃদুলা মিত্রকে বললেন—ঘোষসাহেব একবার রিটায়ার করুক, তারপর তোমাকে আমি দেখে নেব।

ঘোষসাহেব ব্যাচেলর। কিন্তু স্বভাব-চরিত্র তার ভীষ্মের মতো, এ-অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

ঘোষসাহেবের পিওন এসে অধীর ভটচাযকে বলল—ঘোষসাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

হাত কচলাতে কচলাতে ঘোষসাহেবের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন অধীর ভটচায।

ঘোষসাহেব আড়চোখে একবার দেখলেন অধীর ভটচাযকে। জিজ্ঞেস করলেন—কোনো আর্জেন্ট কেস আছে?

—আছে স্যর। তিনটে আর্জেন্ট কেস আছে।

ঘোষসাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—তিনটে আর্জেন্ট কেস নিয়ে বসে বসে ঘুমোচ্ছেন?

বিনয়ে বিগলিত হয়ে অধীর ভটচায বললেন—আর ঘুমোব না স্যর। আজই করে দিচ্ছি।

—হোয়াই দি ডিলে? যান, আমি আপনার কোন কথা শুনতে চাই না। আমি আপনার একসপ্ল্যানেশন চাই।

এখানে সত্যকথা বলা অসম্ভব। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে তাহলে, মিস্ মৃদুলা মিত্রের কিছুই হবে না, অধীর ভটচায মারা পড়ে যাবেন।

অধীর ভটচায কাচুমাচু হয়ে বললেন—স্যর, এক্ষুনি আমি করে দিচ্ছি। আর কখনো এ রকম হবে না।

ঘোষসাহেব চোখ তুলে তাকালেন অধীর ভটচাযের দিকে। তারপর দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন না, নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন—আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাব। জরুরী কাজ আছে। আর্জেন্ট কেসগুলো আজই আপনি করে যাবেন, কাল এসেই যেন আমার টেবিলে পাই। যান—

বলির পাঁঠার মতো ঘোষসাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অধীর ভটচায।

সেকশনে এসে নিজের চেয়ারে বসে অধীর ভটচায মনে মনে বললেন—শালা ঘোষসাহেব রিটায়ার করলে হরির লুট দেবো। কিন্তু ঘোষসাহেবের রিটায়ার করতে এখনো বছর তিনেক বাকি।

ঘড়িতে তিনটে বাজতে-না-বাজতেই মিস মৃদুলা মিত্র হাতব্যাগ নাচাতে নাচাতে বেরিয়ে গেলেন। জরুরী কাজ আছে।

তিনটি আর্জেন্ট কেস নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন অধীর ভটচায। প্রাণ যাক আর থাক, এই তিনটি কেস আজ শেষ না করলেই নয়।

অধীর ভটচায ডাকলেন—সুধাংশুবাবু, একবার এদিকে আসুন।

সুধাংশুবাবু পাকা কেরানি। বড়বাবুর ডাক শুনেই ছুটে এলেন। বললেন—বড়বাবু, মিস্ মিত্র তো প্রায়ই তিনটের সময় চলে যান। আপনি ওকে প্রায়ই যেতে এলাউ করেন কেন?

অধীর ভটচায গম্ভীর গলায় বললেন—আমাকে উপদেশ দেবেন না। মনে রাখবেন আমি আপনার উপরওয়ালা। নিজের চরখায় তেল দিন। ডু ইওর ওউন ডিউটি। শুনুন, আপনি নিজে গিয়ে আকাউন্টস সেকশন থেকে এ মাসের ক্যাশ রেজিস্টারটা নিয়ে আসুন।

সুধাংশুবাবু ম্লানমুখে অ্যাকাউন্টস্ সেকশনের দিকে চললেন।

অধীর ভটচায আর্জেণ্ট কেসে মন দিলেন। কিন্তু মন দিয়ে কোনো কাজ করার কি উপায় আছে। বামাপদ নামে একটি ছোকরা কেরানি আছে, অধীর ভটচাযের সেকশনে। বামাপদ টুকটুক করে অধীর ভটচাযের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

—কী চাই ?

—বড়বাবু, হাসপাতালে যেতে হবে, আমি কিন্তু আজ একটু আগে যাব।

অধীর ভটচায টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন—হবে না, হবে না। এটা সরকারী আপিস, মামাবাড়ি নয়। হাসপাতাল তো দূরের কথা, শ্মশানে যাবার জন্যেও আপনাকে আমি আপিস ছুটির আগে যেতে দেবো না। যান, নিজের সীটে যান, কাজ করুন।

বিড়বিড় করতে করতে আবার নিজের সীটে গিয়ে বসল বামাপদ।

তিনটি আর্জেণ্ট কেস, নিতান্ত সামান্য কথা নয়। অনেক কাগজপত্তর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হলো, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, অধীর ভটচায তবু কাজ শেষ করতে পারলেন না। কাজ শেষ করতে করতে প্রায় ছ'টা বেজে গেল।

সমস্ত আপিস ফাঁকা হয়ে গেছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ছাতাটি হাতে নিয়ে অধীর ভটচায উঠলেন।

রাস্তায় নেমে মুক্তির নিশ্বাস নিলেন। আঃ, কী সুন্দর হাওয়া, ভারি চমৎকার লাগছে। মাথাটা খুব ভার-ভার লাগছিল, ঝিরঝিরে হাওয়ায় মাথাটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বড়ো বিশ্রী খাটনি গেছে আজ।

দেরি যা হবার তা তো হয়েই গেছে, অধীর ভটচায মনে-মনে ভাবলেন, গঙ্গার ধারে গেলে কেমন হয়।

নিজের প্রস্তাব নিজেই সমর্থন করলেন। এখানকার হাওয়াই এত সুন্দর লাগছে, গঙ্গার হাওয়া তো মধু। গঙ্গার ধারে গিয়ে খানিকক্ষণ বেড়ালে সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে-মুছে যাবে, চমৎকার হবে।

কতকাল গঙ্গার ধারে যাওয়া হয় না। হঠাৎ যখন আজ গঙ্গার ধারের কথা মনে হয়েছে, যাওয়া যাক।

হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে এলেন। যা ভেবেছিলেন, তার চেয়ে ঢের বেশী ভালো লাগছে। মনে মনে সাব্যস্ত করলেন, প্রায়ই আপিস ছুটির পর গঙ্গার ধারে আসবেন। এতকাল কেন ঘনঘন আসেননি, সে-কথা ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিলেন।

গঙ্গার উল্টোদিকের ফোর্টের সামনের ফাঁকা মাঠে খানিকক্ষণ বসা যাক।

বসতে গিয়ে অধীর ভটচাযের চোখে পড়ল, আরে সর্বনাশ, মিস্ মৃদুলা মিত্র যে। একা তিনি হলে কথা ছিল না, স্বয়ং ঘোষসাহেবের কোলে তিনি হেলান দিয়ে বসে আছেন, ঘোষসাহেবকে চেনাই যায় না, কোথায় সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঘোষসাহেব, কী স্মিতমুখ তাঁর, আর মিস্ মৃদুলা মিত্রের চোখেমুখে কী লাস্য কী লাস্য, ছ'হাতে ক্ষণে ক্ষণে তিনি ঘোষসাহেবের গলা জড়িয়ে ধরছেন, ক্ষণে ক্ষণে খিলখিল করে হেসে উঠছেন…… জরুরী কাজ বৈকি।

নিজের চোখজোড়া বন্ধ করে ফেললেন অধীর ভটচায। উপরওয়ালার প্রণয়লীলা দেখলে পাপ হয়। চট করে পিছন ফিরে চোখ খুললেন অধীর ভটচায। ছাতা হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে ভাবলেন, ঘোষসাহেব কিংবা মিস্ মৃদুলা মিত্র আমাকে দেখে ফেলেননি তো? ছ'জনের একজনও যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে দেখে থাকেন, তো আমার ভবিষ্যৎ চিরতরে অন্ধকার হয়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে অধীর ভটচায মনুমেণ্টের পাদদেশে এসে থামলেন। ভাগ্য ভালো, মনুমেণ্টের পাদদেশে সেদিন কোনো জনসভা নেই। অধীর ভটচায নিজের ছাতার কাপড়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে প্রতিজ্ঞা করলেন: ঘোষসাহেব রিটায়ার না করলে আর কখনো গঙ্গার ধারে আসব না।

পরদিন খুব ভয়ে ভয়ে আপিসে এলেন অধীর ভটচায। না জানি আজ কপালে কী আছে।

সীটে বসতে-না-বসতেই ঘোষসাহেবের পিওন এসে বলল—সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

হৃৎপিণ্ড ধ্বক করে উঠল। ইষ্টনাম জপতে জপতে অধীর ভটচায ঘোষসাহেবের ঘরের দিকে চললেন।

ঘোষসাহেব বারেক তাকালেন অধীর ভটচাযের দিকে। বললেন—বসুন। দরকারী কথা আছে।

অধীর ভটচায কায়ক্লেশে বসলেন ঘোষসাহেবের মুখোমুখি।

ঘোষসাহেব প্রসন্নহাস্যে বললেন—একটা কনফিডেনসিয়াল সার্কুলার এসেছে। আপনার সেকশনের সবচেয়ে ভালো কেরাণীকে দুটো অ্যাডভান্স ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া হবে। আপনি কার নাম রেকমেণ্ড করবেন ভটচাযবাবু?

এ আবার একটা প্রশ্ন। যার নাম রেকমেণ্ড করলে ঘোষসাহেব তুষ্ট হবেন, তার নামই রেকমেণ্ড করতে হবে। অথচ এমন ভাবভঙ্গি দেখাতে হবে যে, কাজকর্মে নিপুণ বলেই মিস্ মৃদুলা মিত্রকে রেকমেণ্ড না করে অধীর ভটচায থাকতে পারলেন না।

অধীর ভটচায বললেন—স্যর, যদি কাজকর্ম দেখে রেকমেণ্ড করতে হয় তো মিস্ মৃদুলা মিত্রের নামই প্রথমে মনে আসে। আর যদি অন্যান্য কথা ভেবে রেকমেণ্ড করতে হয়……

ঘোষসাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন—যদি অন্যান্য কথা ভেবে রেকমেণ্ড করতে হয়, তাহলে?

—তাহলে মুকুন্দ গুপ্তের নামই রেকমেণ্ড করতে হবে। মুকুন্দ গুপ্ত কাজকর্ম খুব খারাপ করলে কী হবে, ওর মামাশ্বশুর যে হাইসার্কেলে ঘোরাঘুরি করেন।

ঘোষসাহেব উদার গলায় বললেন—সে-সব আমরা কেয়ার করব না। আমরা কাজের লোক, কাজ ছাড়া আর কিছু বুঝি না। তা ভটচায মশাই, আপনার বিচার-বিবেচনার উপর আমার আস্থা আছে, কারো পরোয়া না করে আপনি যাকে খুশি রেকমেণ্ড

করবেন, আমি চোখ বুজে সই করে দেবো। যান।

বিদায় নিয়ে চলে এলেন অধীর ভটচায। যাক, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তাঁর। ফাঁড়া কেটে গেছে।

একটা ফাইল খুলে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন মিস্ মৃত্তুলা মিত্র যেন ফাইল ছাড়া জীবনে আর কিছু জানেন না। এমন নিভাঁজ সুশীলা হয়ে বসে আছেন, নিজের চোখে না দেখলে অধীর ভটচাযও বিশ্বাস করতে পারতেন না, ইনিই কাল গঙ্গার ধারে ঘোষসাহেবের কোলে বসে প্রচুর লাস্য করেছেন।

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে অধীর ভটচায মনে মনে মিস্ মৃত্তুলা মিত্রকে বললেন—ঘোষসাহেব রিটায়ার করুক, তারপর তোমার আমোদ আমি ঘুচিয়ে দেবো। তারপর আমি প্রত্যহ বুক ফুলিয়ে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াব।

সেদিন রাত্রে মহামায়া (অধীর ভটচাযের স্ত্রী) বললেন—ছেলেমেয়েদের নিয়ে লোকে কত দেশ-বিদেশে বেড়াতে যায়। দেশ-বিদেশ যেতে পয়সা না কুলোয়, ছেলেমেয়েদের দু-একদিন গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে নিয়ে এলেও তো পারো।

গঙ্গার ধারের কথা শুনে তড়াং করে উঠলেন অধীর ভটচায। বললেন—খবদ্দার, মুখ সামলে কথা বলবে, গঙ্গার ধারের কথা মুখেও আনবে না।

মহামায়া অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। গঙ্গার ধারের নাম শুনেই স্বামী হঠাৎ এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কেন? ভিতরে নিশ্চয় কিছু জটিল রহস্য আছে।

মহামায়া রাগ করে বললেন—কার ভয়ে আমি মা গঙ্গার নাম মুখে আনব না শুনি? কথায় কথায় তুমি অত মেজাজ দেখাবে না, এ আমি বলে দিলাম।

সত্যি, অত রূঢ় গলায় বৌকে ধমক দেওয়া উচিত হয়নি। মহামায়ার কী দোষ। অবোধ মেয়েমানুষ, দিনরাত ঘর-সংসার

নিয়ে আছে, গঙ্গার ধারের মর্ম সে কী জানে।

অধীর ভটচায নরম গলায় বললেন—গঙ্গার ধারের খবর যদি শোনো তো তুমি আমাকে কিছুতেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে যেতে বলতে পারতে না।

চোখ কপালে তুলে মহামায়া বললেন—কী খবর গো?

অধীর ভটচায ফিসফিস করে বললেন—আমি গঙ্গার ধারে আজকাল যদি বেড়াতে যাই, ফল কী হবে জানো? হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, তোমার শাখা-সিঁদুরের পাট চুকে যাবে।

—আঃ, কী যে যা-তা বলো।

—যা-তা নয় গো, খাঁটি কথা।

—যাঃ!

—সত্যি বলছি।

—খুলে বলো না।

—এখন না। ছেলেমেয়েরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে তোমাকে বিশদ করে বলব। খুব গোপন খবর কিন্তু। তুমি যেন আবার পাঁচকান করো না।

মহামায়া খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেললেন। ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে এসে দেখলেন অধীর ভটচায চোখ বুজে পড়ে আছেন।

—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি গো?

—উহুঁ। একটা পান সেজে দাও তো।

পান সেজে দিলেন মহামায়া। বললেন—এবার বলো। শুনি। আমার আর সবুর সইছে না।

অধীর ভটচায পান চিবুতে চিবুতে বললেন—সে-সব খুব ঘেন্নার কথা। তোমার মতো সতীসাধ্বীর শোনা উচিত নয়। থাক, তুমি না শুনলে।

মহামায়া কঁদো কাঁদো গলায় স্বামীর হাত ধরে বললেন—ওগো, আমাকে আর দগ্ধে মেরো না। তুমি যদি সব কথা আমাকে

খুলে না বলো তো আমি মাথা খুঁড়ে মরব। আমার বড় ভয় করছে গো।

—আঃ, ভয়ের কিছু নেই। মহামায়াকে অভয় দিলেন অধীর ভটচায—ছাড়বে না যখন, শোনো।

আদ্যন্ত ঘটনা সবিস্তারে শোনালেন মহামায়াকে।

রাগে গজগজ করতে করতে মহামায়া বললেন—তোমার ঘোষসাহেবের ঠিকানা দাও। কালই আমি তার বৌকে গিয়ে সব কথা জানিয়ে দিয়ে আসব।

অধীর ভটচায বিরক্ত হয়ে বললেন—এই জন্যই তোমাকে কিছু বলতে চাইনি। কিছু বুঝবে না, শুনবে না, লাফিয়ে উঠবে। ঘোষসাহেবের বৌ কোথায়? বারবার বলছি, ঘোষসাহেব ব্যাচেলর।

ইংরেজি জানেন না বলে পলকের জন্য মহামায়ার একটু দুঃখ হলো। জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাচেলর মানে কী গো?

—যে পুরুষমানুষ বিয়ে করে না, ইংরেজিতে তাকে ব্যাচেলর বলে। বুঝলে?

—ও, এইবার বুঝেছি। সেইজন্যই পোড়ারমুখো ঘোষসাহেবের এই কুমতি। আর ওই ধিঙ্গি মেয়েটাকেও বলিহারি। ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো। মুড়োঝাঁটা মারো।

অধীর ভটচায শান্ত হয়ে বললেন—তুমিই বলো, এই অবস্থায় ঘোষসাহেব রিটায়ার করার আগে আমার কি আর গঙ্গার ধারে যাওয়া উচিত?

—কক্ষনো না।

—জানো, মনে মনে ঠিক করেছি, ঘোষসাহেব রিটায়ার করলে প্রত্যেকদিন আমি ছুটির পর গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবো। ছুটিছাটার দিন ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে যাব। তোমাকেও নিয়ে যাব দু-একদিন।

আনন্দে মহামায়ার চোখে জল এসে গেল। আহা, জন্ম-জন্মান্তরে যেন এরকম স্বামী হয়। কিছুক্ষণ আগে গঙ্গার ধারের

ইতিহাস না জেনে এ স্বামীকে দু-একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছেন বলে মহামায়ার খুব দুঃখ হলো। অন্যায় কথা বলে হয়তো স্বামীর বুকে ব্যথাও দিয়ে ফেলেছেন।

অনুশোচনায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন মহামায়া।

হঠাৎ মহামায়ার কী একটা কথা মনে এল। বললেন—ওগো, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে ?

—উঁহু।

—আমার একটা কথার জবাব দেবে ?

—বলো।

—যমুনার ধারে কদমতলায় গিয়ে তো লীলাখেলা করতে হয়। তোমার ঘোষসাহেব লীলাখেলা করতে গঙ্গার ধারে যায় কেন।

পাশ ফিরতে ফিরতে অধীর ভটচায বললেন—কলকাতায় যমুনা কোথায় ? মধ্বাভাবে গুড়ং। যমুনার অভাবে ঘোষসাহেবকে গঙ্গার ধারে গিয়ে কাজ সারতে হচ্ছে।

এতক্ষণে আশ্বস্ত হলো মহামায়া।

সব দিনের হিসেব দাখিল করার কোনো অর্থ হয় না, দিনের পর দিন গেল, ঘোষসাহেব একদিন রিটায়ার করলেন। তার জায়গায় এলেন মুখার্জিসাহেব। প্রথমেই ডেকে পাঠালেন অধীর ভটচাযকে।

—আমাকে ডেকেছেন স্যর ?

—ইয়েস। আপনিই বড়বাবু ?

—ইয়েস স্যর।

—বসুন।

মুখার্জিসাহেবের সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসলেন অধীর ভটচায।

মুখার্জিসাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কী সব কাজকর্ম হয় আপনার সেকশনে, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দেখি।

সমস্ত কাজকর্মের হিসেব দাখিল করতে হলো। ঝানু সাহেব।

দু-এক কথাতেই সব বুঝে নিলেন। বললেন—শুনুন, ভটচাযবাবু আমার কিন্তু কাজ সম্পর্কে খুব দুর্নাম আছে। দারুণ খুঁতখুঁতে আমি। আইন-কানুন নখদর্পণে রাখবেন সব সময়ে, কাজে গাফিলতি কিন্তু আমি একেবারেই সহ্য করি না। কাজ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

—ইয়েস স্যর। আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

-থ্যাঙ্কিস্। কাল থেকে আমি সমস্ত রিপোর্ট-রিটার্ন নিজের চোখে দেখব। সব আপ-টু-ডেট হাওয়া চাই। আচ্ছা, আজ তাহলে আসুন।

প্রথম দিনেই কাজ নিয়ে এমন আটাঁআঁটি আর কোনো সাহেব করেননি। অধীর ভটচায আরেক ঝামেলায় পড়লেন। সমস্ত রিপোর্ট-রিটার্ন আপ-টু-ডেট করে দিতে হলে অধীর ভটচাযকে দিনকয়েক স্নানাহার ভুলে যেতে হবে।

পর পর পাঁচ দিন রাত আটটার আগে আপিস থেকে বেরোতে পারলেন না অধীর ভটচায। এত কাজের চাপ।

তারপর একদিন সাড়ে ছ'টা নাগাদ হাতের কাজ শেষ হয়ে গেল। গঙ্গার ধারের কথা অধীর ভটচায ভোলেননি।

ছাতা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধরে এলেন। কতকাল বাদে এলেন।

গঙ্গার উল্টোদিকে কোর্টের সামনে খানিকক্ষণ বসা যাক।

বসতে গিয়ে অধীর ভটচাযের চোখে পড়ল, আরে সর্বনাশ, মিস্ মৃদুলা মিত্র যে, স্বয়ং মুখার্জিসাহেবের কোলে হেলান দিয়ে বসে আছেন, সেই মুখার্জিসাহেব—কাজ ছাড়া যিনি আর কিছু জানেন না। মিস্ মৃদুলা মিত্রের চোখে-মুখে অবিকল সেই আগের লাস্য, দু'হাতে ক্ষণে ক্ষণে তিনি মুখার্জিসাহেবের গলা জড়িয়ে ধরছেন, ক্ষণে ক্ষণে খিলখিল করে হেসে উঠছেন।

ঘোষসাহেবের জায়গায় মুখার্জিসাহেব। এছাড়া কোথাও আর কিছু বদল হয়নি।

নিজের চোখজোড়া বন্ধ করে ফেললেন অধীর ভটচায।

উপরওয়ালার প্রণয়লীলা দেখলে পাপ হয়। চট করে পিছন ফিরে চোখ খুললেন অধীর ভটচায। ছাতা হাতে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে ভাবলেন: মুখার্জিসাহেব কিংবা মিস্ মৃদুলা মিত্র আমাকে দেখে ফেলেননি তো? দু'জনের একজনও যদি আমাকে ঘুণাক্ষরে দেখে থাকেন তো আমার ভবিষ্যৎ চিরতরে অন্ধকার হয়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে অধীর ভটচায মনুমেন্টের পাদদেশে এসে থামলেন। ভাগ্য ভাল সেদিনও মনুমেন্টের পাদদেশে কোনো জনসভা নেই। ছাতার কাপড়ে মুখের ঘাম মুছে অধীর ভটচায মনুমেন্টের পা ছুঁয়ে বললেন: বাবা মনুমেন্ট, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, নিজে রিটায়ার না করে আর কখনো গঙ্গার ধারে আসব না।

—

টর্চ

সংসারে আসতে হয় একা, যেতে হয় একা, কিন্তু মাঝামাঝি সময়টা পুরোপুরি একা-একা কাটানো যায় না। অন্তত সদানন্দের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল। পকেটের অবস্থা নিতান্ত খারাপ না থাকলে, অমাবস্যার সন্ধ্যায় সদানন্দ ময়দানে না এসে পারে না।

স্পষ্টাক্ষরে বলে দেওয়া ভালো, সদানন্দ সুখের সন্ধানে ময়দানে আসে।

এ-লাইনে সদানন্দ নতুন খদ্দের নয়। বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে সদানন্দ জানে, ময়দানের মতো নিরাপদ সুখের জায়গা ভূ-ভারতে কোথাও নেই।

দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো অমাবস্যায় সদানন্দের ময়দান বাদ পড়েনি। আজকাল তো বোমা-বারুদের জন্যে আমোদ-আহ্লাদের বিশেষ কোনো উপায় নেই, কিন্তু কোন শালার বুকে এমন পাটা যে, ময়দানে এসে বোমাবাজি করে! এখানে পুলিশ রীতিমত সজাগ আছে।

কলকাতা বন্ধ্? বাঙলা বন্ধ্? সব বন্ধ্‌কে সদানন্দ কলা দেখিয়েছে। হুঁ-হুঁ কোনো অমাবস্যাতেই কলকাতা বা বাঙলা বন্ধ্ হয়নি।

সারাজীবন তরীখানা বেয়ে যাবেন অথচ কখনো তুফানে পড়বেন না, এইরকম ঘটনা প্রায় অসম্ভব। দীর্ঘকাল সদানন্দ নিরাপদে তরীখানা বেয়ে এসেছে, এই অমাবস্যায় হঠাৎ তুফানে পড়ল।

হ্যাঁ, গোড়া থেকে বলাই ভালো।

কিন্তু দিনকাল ভালো নয়, খোলাখুলি সব কথা বলা যাবে না, আভাসে-ইশারায় সারতে হবে, যতদূর জানি, আপনারাও

নিতান্ত কাচ খোকাখুকু নন, মাল বুঝে নিতে আপনাদের এক-মুহূর্তের বেশি সময় লাগবে না।

অমাবস্যা। ময়দান। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার। সদানন্দ। এবং···

এখানে কারো কিছু কথা শোভা পায় না।' চলুক।

কস্মিনকালেও যা ঘটেনি সেদিন হঠাৎ তাই হলো। সরু গলায় কে ধমক দিয়ে উঠল—হ্যাণ্ডস আপ।

এই আদেশ অমান্য করা অসম্ভব। সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে সদানন্দ দু-হাত উপরে তুলল।

আবার হুকুম হলো—উঠুন। দু'জনেই উঠুন।

একা সদানন্দ নয়, দু'জনকেই উঠতে হলো। নিজের ইচ্ছায় নয়, হুকুম মেনে দু'জনকেই আসতে হলো বড় রাস্তার কাছে, গাছতলায়।

জীবনে সদানন্দ কখনো পুলিশের খপ্পরে পড়েনি, এই প্রথম। কিন্তু আগেই বলেছি, সদানন্দ নিতান্ত অভিজ্ঞ পুরুষ, পুলিশের সঙ্গে কীভাবে কথাবার্তা বললে সুফল হবে সেটি তার অজানা নয়। অজানা না হলেও সদানন্দের ভয় হলো। সদানন্দ বোমা মারেনি, ছুরিও চালায়নি। সদানন্দ পুলিশ দেখে ভয় পাবে না তো পুলিশ দেখে ভয় পাবে কে।

গাছতলার বাঁধানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশ হিলে-হিলে ঠোক্কর তুলে এমন এক আওয়াজ তুললো যে সদানন্দের একবার ইচ্ছা হলো যে, নীচু হয়ে পুলিশের পায়ের ধুলো নেয়।

সদানন্দ একটু সাহসী হয়ে আস্তে আস্তে বলল—সাহেব, আপনার সঙ্গে দু-একটি প্রাইভেট কথা বলতাম যদি দয়া করে আপনার নামটি বলেন তো মনের কথা সরাসরি বলতে খুব সুবিধে হতো।

সাহেব আপত্তি করলেন না। গলা গম্ভীর রেখে বললেন—আমার নাম গণেশ বিশ্বাস।

সুন্দর নাম। চমৎকার নাম। 'গণেশবাবু,···নাঃ, খুব ভালো

শোনাচ্ছে না। 'বিশ্বাসসাহেব...' আঃ, চমৎকার আওয়াজ দিচ্ছে।

সদানন্দ বলল—বিশ্বাসসাহেব, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

—বলুন।

—আমার কাছে একটি চকচকে সিকি আছে। অচল নয়। আপনার কাছে ম্যাগনেট থাকলে পরখ করে নিতে পারেন।

বিশ্বাসসাহেব বললেন—আমার কাছে কোনো ম্যাগনেট নেই।

ঠিক। ম্যাগনেট থাকবে কেন? কোনো পুলিশের পকেটে ম্যাগনেট থাকে না। পুলিশকে অচল সিকি ঘুষ দিয়েছে এমন কোনো পাপীর নাম পর্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়নি।

সদানন্দ একটু চিন্তা করে বলল—বিশ্বাসই আসল কথা, বিশ্বাসসাহেব। আমাকে বিশ্বাস করে সিকিটি পকেটে রেখে দিন, আমি আজ বাড়ি চলে যাই। সামনের অমাবস্যায় আমি আবার ময়দানে আসব, অবশ্যই আসব, সিকিটি যদি বিন্দুমাত্র অচল হয় তো সেদিন আপনি আমাকে ধরে গারদে ভরে রাখবেন, এই আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি হয়ে রইল। আজ তাহলে চলি।

বিশ্বাস সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—শাট আপ। আমাকে আপনি ঘুষ দিতে চাইছেন? আপনার সাহস তো কম নয়?

সদানন্দের সমস্ত হিসেব ওলোট পালোট হয়ে গেল। কোন রাজ্যে আছি রে বাবা। বেঁচে আছি না মরে গেছি। আরে পুলিশ ঘুষ খেতে চায় না!

সদানন্দ বাধ্য হয়ে বলল—বিশ্বাসসাহেব, মাছে এখনো জল খায়, সূর্য এখনো পূর্বদিকে ওঠে, আপনি কোন দুঃখে ঘুষ খাবেন না?

বিশ্বাসসাহেব রাগ করে বললেন—আপনি খুব সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলবেন মশাই। তা না হলে আপনার কপালে কিন্তু অশেষ দুর্গতি আছে।

সদানন্দ সাবধান হলো। বিশ্বাসসাহেবের একটা মান-মর্যদা আছে, এবং সিকির আজকাল কোনো বাজারদর নেই। একটা সিকি দিয়ে বাজারে আধ কেজি পাকা কুমড়ো ছাড়া আর কিছু পাওয়া অসম্ভব। বিশ্বাসসাহেব বোঝা যাচ্ছে পাকা মাল, উনি আধ কেজি পাকা কুমড়ো খাওয়ার বান্দাই নন।

সদানন্দ অনুমান করল, খুব বেশিদূর যেতে হবে না, একটা আধুলি ফেললেই বিশ্বাসসাহেব ঘায়েল হয়ে যাবেন।

সদানন্দ সাবধান হয়ে বললেন—বিশ্বাসসাহেব, আমার উপর খুব রাগ করলেন নাকি ?

গণেশ বিশ্বাস বললেন—আপনি আমাকে সিকি দেখাচ্ছেন, এতেও যদি রাগ না করি, কিসে আর রাগ করব ? পুলিশে চাকরি করি বলে আপনি আমাকে যা-তা ভাববেন না। মনে রাখবেন, অমি যেন-তেন বংশের সন্তান নই।

সদানন্দ দুঃখ করে বলল—অন্ধকারের জন্য যদিও এখনো আমি আপনার মুখ দেখতে পাইনি, কিন্তু আপনার গলা শুনে গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আপনি কোনো মান্যগণ্য বংশের সন্তান। মান্যগণ্য বংশ সম্পর্কে বরাবর আমার দারুণ আগ্রহ। দয়া করে আপনার বংশ সম্পর্কে দু-চার লাইন আমাকে যদি বলেন···

আর কিছু বলতে হলো না, গণেশ বিশ্বাস বংশের ইতিহাস সবিস্তারে বলে যেতে লাগলেন। বিরাট জমিদারের বংশ। জমিদারি লাটে উঠেছে কিন্তু রক্তের গৌরব যাবে কোথায় ? কপালের জোর নেই বলে গণেশ বিশ্বাসকে ময়দানে ডিউটি দিতে আসতে হয়েছে, অথচ, বললে হয়তো লোকে বিশ্বাস করবে না, সাহারাণপুরে এখনো গণেশের ঠাকুদ্দার নামে একটা রাস্তা আছে, গণেশের জ্যেঠামশায়ের নামে অবন্তীপুরে একটা পুকুর আছে, গণেশের কাকার নামে হরিদ্বারে একটা ধর্মশালা আছে, গণেশের বাবার নামে কানপুরে একটা আশ্রম আছে।

গণেশ বিশ্বাস যে ভাবে আউড়ে যাচ্ছেন, সদানন্দের মনে হলো

হয়তো অন্ধকার গাছতলায় সারারাত শুনলেও বিশ্বাসবংশের ইতিহাস শেষ হবে না। সদানন্দ মরীয়া হয়ে বলল—আপনার কথা কে অবিশ্বাস করবে? যেভাবে ডিউটি করছেন, লোকে হয়তো একদিন দেখবে আপনার নামে এই ময়দানের নাম হয়ে যাবে। লোকে বলবে, 'গণেশ ময়দান'। এখানে এলেই সিদ্ধি।

বিশ্বাসসাহেব আপত্তি করলেন না।

কিন্তু এদিকে রাত ক্রমশ বাড়ছে। সদানন্দ বলতে গেলে তুফানে পড়েছে, বিশ্বাসসাহেবের হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি নিস্তার পাওয়া যায় ততই ভালো।

বিশ্বাসসাহেব বললেন—ভুলেও আমাকে আর কখনো সিকির কথা বলবেন না। আপনি ঘোরতর অন্যায় করেছেন।

সদানন্দ মেনে নিয়ে বলল—অন্যায় করেছি, আর কখনো সিকির কথা বলব না। অনুমতি করুন এবার তাহলে কাজের কথা বলি।

—বলুন।

—আধুলি।

—আধুলি?

সদানন্দ অবাক হয়ে বলল—আপনি যে বিশ্বাসসাহেব আকাশ থেকে পড়ছেন। অত বড়ো বংশের সন্তান হয়েও আপনি আধুলি চেনেন না?

গণেশ বিশ্বাস গরম গলায় বললেন—ফের? আপনি আমাকে আধুলি দেখাচ্ছেন?

সদানন্দ ঠাণ্ডা গলায় বলল—আহা, অত চটছেন কেন? আপনার পূর্বপুরুষ লক্ষ-লক্ষ আধুলি নিয়ে কারবার করেছেন, আর আপনি সামান্য একটা আধুলির কথায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন?

গণেশ বিশ্বাস প্রায় আর্তনাদ করে বললেন—আপনি যদি এখনো সাবধান হয়ে কথা না বলেন শেষ পর্যন্ত আপনাকে হাই-

কোর্ট পর্যন্ত যেতে হতে পারে কিন্তু, তাহলে সহজে আপনি খালাস পাবেন না।

হাইকোর্টের কথায় সদানন্দের বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। হাইকোর্টে গেলে কোনো কথাই গোপন থাকবে না, উকিলের জেরায়-জেরায় সব কেচ্ছা বেরিয়ে পড়বে, সমাজে মুখ দেখানো দায় হবে।

সদানন্দ দুঃখ করে বলল—বিশ্বাসসাহেব, এতক্ষণ ধরে আপনাকে এত সাধ্যসাধনা করছি কিন্তু কিছুতেই আপনার মন পাওয়া যাচ্ছে না। একটা আধুলির কথায় আপনি এত রেগে যাচ্ছেন যেন একটা আধুলি পড়লে পুলিশের পকেট অশুদ্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বাসসাহেব ধমক দিয়ে বললেন—আপনার স্বভাব কি কিছুতেই যাবে না। আপনার মুখে কি কেবল সিকি-আধুলির কথাই লেগে থাকবে?

কোনো ইতিঅন্ত না পেয়ে সদানন্দ আপন মনে বলল—কে বলে নারী রহস্যময়ী। সব ফিলজফি উল্টে গেল। এ যে দেখছি, পুলিশই রহস্যময়।

ভাব-গতিক দেখে মনে হচ্ছে বিশ্বাসসাহেব বোধহয় আস্ত একটি টাকা না নিয়ে সদানন্দকে রেহাই দেবেন না।

কিন্তু আস্ত একটি টাকা?

কোথাও কোনো লেখাপড়া না থাকলেও একথা সকলেই জানেন যে ময়দানের নাগরদেরও একটি সমিতি আছে। সদানন্দ যদি আজ বিশ্বাসসাহেবের পকেটে আস্ত একটি টাকা দেয় তো সমিতির কাছে সেকথা গোপন থাকবে না, কোনো ব্যক্তির বাবার সাধ্য নেই যে সমিতির কাছে কোনো কথা গোপন রাখে। পুলিশকে আধুলি পর্যন্ত দিলে সমিতির কাছে ক্ষমা আছে, কিন্তু সদানন্দ মর্মে মর্মে জানে পুলিশকে আস্ত একটি টাকা দিলে সদানন্দের নামে সমিতিতে চি-চি পড়ে যাবে। ফল? ইহজন্মে সদানন্দ আর ময়দানে আসতে পারবে না।

যা হবার হবে। এখন তো থানা-পুলিশের হাত থেকে

বাঁচা যাক।

সদানন্দ ব্যাকুল হয়ে বলল—বিশ্বাসসাহেব, বিস্তর রাত হয়ে গেল, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, একটু কিছু রফা করে ফেলুন, আর তো পারি না।

—দেখুন, আপনি সহজ লোক নন, আপনার কথাবার্তা শুনে আমার মনে নানারকম খারাপ-খারাপ সন্দেহ হচ্ছে, আপনাকে নিয়ে কী করব এখনো আমি পাকাপাকি সাব্যস্ত করে উঠতে পারিনি।

তাড়াতাড়ি রেহাই পাবার জন্যে সদানন্দ বলল—ভাঙাভাঙা কথায় আর দরকার নেই, আমার মান-সম্মান জাহান্নামে যাক, ঠাকুর গিরিশ ঘোষের কাছে যা চেয়েছিলেন আপনাকে আমি তাই দেব, ষোলো আনা। নিন, ছাড়ুন।

অন্ধকার অত গাঢ় বলে কিছু দেখা গেল না। আসলে সদানন্দ এক টাকার একখানা চকচকে নোট বিশ্বাসসাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

গণেশ বিশ্বাস হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। তিনি বিচলিত গলায় বললেন—এতক্ষণ মুখে-মুখে হচ্ছিল, কিন্তু এখন আপনি যা করেছেন বলে আমার সন্দেহ, আপনি যদি সত্যই তা করে থাকেন তো আপনার বাবোটা বাজিয়ে ছাড়ব।

বলে গণেশ বিশ্বাস মস্ত লম্বা টর্চ বাগিয়ে বোতাম টিপে দিলেন। হ্যাঁ, ঠিক, সদানন্দের হাতে একখানা চকচকে এক টাকার নোট। উত্তেজনায় গণেশ বিশ্বাসের হাতের টর্চ কাঁপতে লাগল, জোরালো, আলো ঢেউ ভেঙে পড়ল আশেপাশের গাছ-পালায়, পায়ের কাছের ঘাসে, সবদিকে এবং শেষ পর্যন্ত সদানন্দের চোখে। পুলিশের লম্বা টর্চের জোরালো আলো ইতিপূর্বে কখন সদানন্দের চোখে পড়েনি, পলকে সদানন্দের চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

আলো নিভিয়ে গণেশ বিশ্বাস বললেন, আপনাকে ভালো করে দেখে রাখলাম, আর কোনো কথা শুনতে চাই না,

থানায় চলুন।

সদানন্দ নিরুপায় হয়ে বলল—চলুন। কিন্তু হেঁটে যাব না। ট্যাক্সিতে যাব। ট্যাক্সি ডাকুন।

গণেশ বিশ্বাস ঘাড় নেড়ে বললেন—না। নিয়ম নেই। আপনি পুলিশের গাড়িতে চলুন।

—না। পুলিশেব গাড়িতে আমি যাব না। গভর্ণমেণ্টের গাড়ি, নির্ঘাৎ মাঝ রাস্তায় গিয়ে ব্রেকডাউন হবে, এত রাত্রে আমি মাঝ রাস্তায় গভর্নমেণ্টের গাড়ি ঠেলতে পারব না। আপনি ট্যাক্সি ডাকুন। ভাড়া আমি দেব।

এ-বিষয়ে দেখা গেল গণেশ বিশ্বাসের কোনো আপত্তি নেই।

একটা ট্যাক্সি জোগাড় করতে আপনি আমি গলদঘর্ম হয়ে যাই, কিন্তু পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই, গণেশ বিশ্বাসেব একটি তুড়িতে ট্যাক্সি এসে হাজির।

বমাল সদানন্দকে উঠতে হলো ট্যাক্সিতে। গণেশ বিশ্বাস ড্রাইভারের পাশে বসলেন।

থানা।

ও-সির ঘরে গণেশ বিশ্বাস বমাল সদানন্দকে নিয়ে ঢুকলেন। এবং ঢুকেই গণেশ বিশ্বাস পুলিশী কায়দায় সেলাম ঠুকলেন ও-সিকে।

বমাল সদানন্দকে এক পলক দেখে নিয়ে ও-সি তাকালেন গণেশ বিশ্বাসের দিকে।

গণেশ বিশ্বাস বলতে আরম্ভ করলেন—স্যর, এই ভদ্রলোক অন্ধকার ময়দানে বসে···

—হরিনাম সংকীর্তন করছিলেন না! ও-সব বলতে হবে না, এক পলকেই বুঝে নিয়েছি।—ও-সি বাধা দিয়ে বললেন—বাদবাকি কিছু বলার থাকলে বলতে পারো।

খানিকক্ষণ আগের দারুণ দৃশ্য গণেশ বিশ্বাসের মনে পড়ে গেল। তিনি কাতর গলায় বললেন—স্যর, এই ভদ্রলোক আরো একটি জঘন্য কাজ করেছেন। খুবই জঘন্য কাজ। স্যরের সামনে

বলতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।

ও-সি উদার গলায় বললেন—বুঝেছি। তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলব। একটু বাদেই তোমাকে ডাকব, যাও।

ও-সি সবিনয়ে বললেন—আহা, কী আশ্চর্য, আপনারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। বসুন, বসুন।

দু'জনকেই পাশাপাশি চেয়ারে বসতে হলো।

ও-সি তারপর সদানন্দকে বললেন—দেখুন, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি গণেশকে ঘুষ নিয়ে সাধাসাধি করেছিলেন, না?

সদানন্দ অবাক হয়ে বলল—কিন্তু, স্যার সেটা কি খুব জঘন্য কাজ? পুলিশকে তো বরাবরই লোকজন ঘুষ নিয়ে সাধে এবং পুলিশও কখনো লোকজনের মনে কষ্ট দেয় না।

ও-সি সহাস্যে বললেন—মশাই, ও-সব গতজন্মের কথা ভুলে যান, এখন কড়া ডিসিপ্লিন, আজকাল পুলিশ আর ঘুষ খায় না।

—স্যার, আমাকে দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন ব্যাপারটা। বরাবরের একটা ভালো নিয়ম হঠাৎ এমন উৎখাত হয়ে গেল কেন?

ও-সি ব্যাখ্যা করে বললেন—কারণ আছে বৈকি, অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গাওয়া যায়, তাছাড়া আর কিছু হয় না। পুলিশকে ঘুষ দিতে-দিতে লোকজনের পকেট ফাঁকা হয়ে যেত, ফলে চোর-জোচ্চোর গুণ্ডা-বদমাস পকেটমার ইত্যাদির কারবার প্রায় ডুবু-ডুবু, তাদের সমবেত দাবির কাছে মাথা হেঁট না করে উপায় নেই।

—কোনো উপায় নেই?

ও-সি ঘাড় নেড়ে বললেন—না। আগে ওঁরা, তারপর আমরা। ওঁরা জমজমাট হয়ে না থাকলে আমাদের ডিপার্টমেন্টের আর জৌলুষ কোথায়? পুকুরে মাছ না থাকলে জাল-বঁড়শির আদর হবে কেন?

সদানন্দের বুকে আর ভয়-ডর বলে কিছু রইল না, একেবারে নির্ভয় হয়ে সদানন্দ বলল—আপনারা কি আজকাল তাহলে গুণ্ডা-বদমাসও ধরেন না ?

ও-সি প্রায় হতাশ হয়ে বললেন—তবে আর এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কী বকবক করলাম। গত ছ-মাসের মধ্যে আমার থানায় কোনো গুণ্ডা-বদমাসকে এনে কেউ একটা কড়া কথা বলেছে, এমন যদি কক্ষনো ঘুণাক্ষরেও শোনেন তো আমাকে জানাবেন, আমি গোঁফ কামিয়ে মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরে কনখলের দিকে সটান হাঁটাপথ ধরব। যাক আর কখনো কোনো পুলিশকে ঘুষটুষ নিতে অনুরোধ করবেন না, চরম বিপদে পড়ে যাবেন।

—বিপদে তো পড়েই গেছি স্যর, বিনা দোষে থানায় এসে ঢুকেছি।

ও-সি ঘাড় নেড়ে বললেন—একেবারে বিনাদোষে বলতে পারেন না, অন্ধকার ময়দানের মধ্যে···

পাশের চেয়ারের দিকে চোখ টিপে ও-সি আর কিছু না বলে একনাগাড়ে হেসে যেতে লাগলেন।

এখন, এতক্ষণে সদানন্দ সিংহের মতো বিক্রমে বলল—কিন্তু স্যর, অন্ধকার ময়দানের মধ্যে নিজের ওয়াইফের সঙ্গে বসলেও কি আপনার পুলিশ আমাকে থানায় ধরে নিয়ে আসবে ?

যেন চোখের সামনে ফণাতোলা কালকেউটে দেখছেন, এমনি-ভাবে চমকে উঠলেন ও-সি। মুখখানা মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর। বললেন—মশাই, আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। ছি-ছি। ছি-ছি। হারামজাদা গণশাকে কালই আমি সাসপেণ্ড করে দেব।

বলেই হুঙ্কার দিলেন—গণেশ, গণেশ।

ক্যাটা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই গণেশ বিশ্বাস আবার ও-সিকে পুলিশী কায়দায় সেলাম করলেন।

ও-সি ফেটে পড়লেন—হারামজাদা, তুমি কাকে ধরে নিয়ে এসেছ ? তুমি তৈরি হও, যা করেছ তাতে তোমার চাকরি

থাকে কি না সন্দেহ।"

গণেশ বিশ্বাস কিছুই বুঝতে না পেরে আচ্ছন্নের মতো গলায় বলল—স্যর, আমি কি তবে চিনতে না পেরে ভুল করে আমাদের কোন বড় সাহেবকে ধরে এনেছি?

ও-সি হাসবেন কি কাঁদবেন, ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। বললেন—না। তা নয়। ইনি একজন ভদ্রলোক। নিজের ওয়াইফের সঙ্গে অন্ধকার ময়দানে বসেছিলেন।

গনেশ বিশ্বাস বললেন—অন্ধকার ময়দানে বসে উনি···

ও-সি টেবিল চাপড়ে বললেন—ঘরে হোক, বারন্দায় হোক, ময়দানে হোক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে হোক, ইডেন গার্ডেনে হোক, সিনেমা হলে হোক, কেওড়াতলা বাণিংঘাটে হোক—যেখানে খুশি সেখানে বসে হ্যাজবাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ যা খুশি করুক তোমার তাতে কী উল্লুক? আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। আর এক্ষুনি এদের একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও।

গণেশ বিশ্বাস ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন।

সদানন্দ উঠে দাঁড়াল, তার ওয়াইফও বসে রইল না। ও-সি খুব ভদ্রভাবে খাতির করে হাত কচলাতে লাগলেন।

কাটা দরজা ঠেলে বাইরে এসেই সিঁড়ি, সিঁড়ি পার হতেই দু'জনে দেখল একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে গণেশ বিশ্বাস চোখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন!

স্ত্রী ট্যাক্সিতে আগে উঠল। তারপর সদানন্দ উঠতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে বাধা, দু-হাঁটু জড়িয়ে গণেশ বিশ্বাস ধপাস করে মাটিতে বসে বলছেন—স্যর, আমাকে ক্ষমা করুন, অন্ধকারে আমি বুঝতে পারিনি যে উনি আপনার ওয়াইফ।

পরম মমতায় গণেশ বিশ্বাসের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সদানন্দ বলল—আপনার আর দোষ কী বিশ্বাসসাহেব, আপনি টর্চ মারার আগে আমিই বুঝতে পারিনি যে উনি আমার ওয়াইফ!

—

আর কোনোদিনও এই বাড়িতে আসবেন না

বড়বাবু হাঁক দিয়ে আমাকে ডেকে বললেন—আপনার টেলিফোন।

আপিসে আমাকে কে টেলিফোন করবে। তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিফোন ধরলাম—হ্যালো।

অপরপ্রান্ত থেকে একটি মহিলার গলা পাওয়া গেল—আমি এমিলি ঘোষ বলছি। আমাকে আপনি চিনবেন না।

বিনয় করে বললাম—চিনব না কেন, পরিচয় দিলে নিশ্চয় চিনতে পারব। গলা শুনে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারছি না।

এমিলি ঘোষ টেলিফোনে ঢেউ তুলে হেসে উঠল, হাসির শব্দটি বড়ো মধুর লাগল।—আপনি শ্যামসোহাগিনী বসুকে চেনেন?

—নিশ্চয়। উনি আমার ছাত্রী। গতবার এম এ পাশ করেছেন।

—উনি আমার মাসিমা। ওঁর পরামর্শেই আপনাকে টেলিফোন করলাম।

—ভালো করেছেন। কী ব্যাপার বলুন তো?

—দয়া করে আজ বিকেলে আপনি একটু আমাদের বাড়িতে আসবেন? বিশেষ দরকার আছে।

বিশেষ দরকারে একজন অচেনা ভদ্রমহিলা আমাকে যেতে বলছেন, এখানে আমার দয়া না করার কোনো অর্থ হয় না। আমি সরাসরি বললাম—কবে দয়া করতে হবে।

—বিশেষ অসুবিধে না হলে আজই চলে আসুন না।

—আচ্ছা। আপনাদের বাড়ির ঠিকানা?

—৩২।১৪-এফ, সাধুবাবা রোড। আমার শ্যামসোহাগিনী মাসিমার বাড়িটা চেনেন তো? তার তিনটে স্টপ পরে বাস থেকে

নেমে বাঁ দিকে মিনিট পনেরো হেঁটে গেলেই সাধুবাবা রোড। মোড়ের বাড়িটাতেই আমরা থাকি।

—আচ্ছা। আজ বিকেলেই যাব। নমস্কার।

—নমস্কার।

পরে হয়তো আর সুযোগ হবে না, এখানেই শ্যামসোহাগিনী বসু বিষয়ে দু-চার কথা নিবেদন করে রাখি।

শ্যামসোহাগিনীর বয়স তিপান্ন বছরের এক মিলিমিটার কম নয়। বিদ্যার সঙ্গে বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই, ওই বয়সেও তিনি বাঙলা সাহিত্যে প্রাইভেট এম এ পরীক্ষায় পাশ করেছেন। নিজমুখে নিজের কথা বলতে চাই না, কিন্তু সত্যের খাতিরে অন্তত এটুকু বলা দরকার যে বাঙলা সাহিত্যে এম এ পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমার তুল্য প্রাইভেট টিউটর কলকাতা শহরে খুব বেশি নেই। দশটা-পাঁচটা সরকারী আপিসে কেরানীগিরি করি, বাদবাকি সময় আমার বাঙলা সাহিত্য নিয়েই কাটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে আটকায়, তা না হলে আমি বাজি রেখে বি এ পাশ না করা যে কোনো স্টুডেণ্টকে আমার শিক্ষাদানের কৌশলে এম এ পাশ করিয়ে দিতে পারি। শ্যামসোহাগিনী কল্পনা করেননি যে কস্মিনকালেও এম এ পাশ করতে পারবেন, কিন্তু করে তো গেলেন। হয়তো আপনারা দেখেছেন খবর-কাগজে সেজন্য ফলাও করে খবর বেরিয়েছিল, শ্যামসোহাগিনীর ফটোও ছাপা হয়েছিল।

এবং শ্যামসোহাগিনী অকৃতজ্ঞ নন। আমার একখানা ছবি নিয়ে উনি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছেন। বলে রাখা ভালো শ্যামসোহাগিনীর একই দেয়ালে আরো কয়েকজন শিক্ষাগুরুর ছবি টাঙানো আছে: রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্যর আশুতোষ।

মনে হচ্ছে, এমিলি ঘোষও আমার ছাত্রী হতে চায়। দেখা যাক।

যেতে-যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ি খুঁজে বের করতে একটুও অসুবিধে হলো না। এই যে ৩২।৫৪-এফ, সাধুবাবা রোড।

কলিংবেল টিপতেই খুলে গেল দরজা। দেখা দিল এমিলি। গায়ে কারো নাম লেখা থাকে না, কিন্তু দেখেই আমার ধারণা হলো, এই মেয়েটি এমিলি না হয়ে যায় না।

এবং আমার ধারণা নির্ভুল। বরাবর দেখেছি, আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত নির্ভুল হয়।

এমিলি সহাস্যে বলল—আসুন, আসুন, আপনার জন্যই ওয়েট করে আছি।

আমি রহস্য করে বললাম—আমাকে তো আগে কখনো খ্যাখেননি, কেমন করে চিনলেন বলুন তো।

—বাঃ, শ্যামসোহাগিনী মাসিমার দেয়ালে আপনার ছবি আছে যে।

কথাটা আমার খেয়াল হয়নি। এমিলি চোখে দেখতে জানে, মনে রাখতে জানে।

আমাকে একটা চমৎকার ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালো। পাখা খুলে দিল। সুন্দরভাবে বসল আমার মুখোমুখি।

দেখুন, জীবনে বিস্তর ছাত্রছাত্রী পড়িয়েছি। ব্যাটাছেলেদের বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না, কিন্তু আমার ছাত্রীদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা সাধারণত অতিশয় তিক্ত। এ যাবত বৃদ্ধা ছাত্রী ছাড়া আমার কপালে অন্য রকম কিছু জোটেনি, সাত মাইল দূরে বসে তো আর কাউকে পড়ানো যায় না, একই টেবিলে কাছাকাছি বসেছি, অধিকাংশ ছাত্রীর মুখেই পেয়েছি বিকট গন্ধ, শুনেছি লিভার খারাপ হলে সকলের মুখেই অমন দুর্গন্ধ হয়, দামী টুথপেস্টেও ঢাকা যায় না। কিন্তু শ্যামসোহাগিনীর বিরুদ্ধে আমার তেমন কোনো বক্তব্য নেই, উনি সারাক্ষণ দোক্তাজর্দা দিয়ে পান চিবুতেন, আমার কোনো অসুবিধে হয়নি।

জীবনে অন্যরকম ছাত্রী পাব, কখনো কল্পনাও করিনি। কল্পনাতীত ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

এমিলির কপালে একটা খয়েরি টিপ, পরনে পাড়ছাড়া একটা দারুন লাল সিফনের শাড়ি, গলায় সবুজ পুঁতির মালা, ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক।

—শুনুন, আগে কাজের কথা শেষ করি। আপনি আমাকে পড়াবেন। 'না' বললে শুনব না। সপ্তাহে দু-দিন বা তিন দিন আসবেন, যেমন আপনার খুশি।

আমি রাজি হয়ে গেলাম।

—বাঃ, আপনি যেন কীরকম। টাকাকড়ির কথা কিছুই হলো না, আগেই রাজি হয়ে গেলেন? আমি কিন্তু মাসে দুশো টাকার বেশি দিতে পারব না।

এমন সুন্দরী ছাত্রী। দুশো টাকা মাইনে। আমি বোধহয় বাঁচব না।

রাজি, রাজি, একশোবার রাজি।

—ও মা, কথায় কথায় আসল কথাই ভুলে গেছি—এমিলি গালে হাত দিয়ে বলল—আপনাকে তো চা-ই দেওয়া হয়নি। গুড গড।

আমাকে কিছু বলতে না দিয়ে এমিলি সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে গেল। সেই সময়ে আমার স্পষ্ট চোখে পড়ল, এমিলির সায়ার প্রান্তে সুন্দর লেশের কারুকার্য।

ফিরে আসতে বেশি সময় নিল না এমিলি। চা, টোস্ট, পুডিং, সন্দেশ। এমিলি নিজের হাতেই নিয়ে এসেছে।

কাপে চা ঢালতে ঢালতে এমিলি বলল—আমার একটা অনুরোধ আছে। আমাকে কিন্তু 'আপনি-আপনি' করতে পারবেন না। নিজের ছাত্রীকে কেউ 'আপনি' বলে নাকি?

আমি বিগলিত হয়ে বললাম—তোমায় আর 'আপনি-আপনি' করব না। আমি ঠিক করে ফেলেছি তোমার স্পেশাল পেপার হবে বৈষ্ণব সাহিত্য।

প্রজাপতির ডানার মতো দুটি ভুরু বাঁকা করে এমিলি বলল—শুনেছি, ভীষণ কঠিন। আমি পারব তো?

আমি অভয় দিয়ে বললাল—আমি তো রয়েছি। এমনভাবে পদাবলী বুঝিয়ে দেব যে তোমার কাছে সব জল হয়ে যাবে। আচ্ছা, তোমার মা-বাবার সঙ্গে আলাপ হবে না ?

এমিলি ঘাড় নেড়ে বলল—উঁহু। বাবা বিজনেসম্যান, হাই সার্কেলে ঘোরাঘুরি করেন, রাত এগারোটার আগে কোনোদিন বাড়ি ফেরেন না। আর আমার মা 'মুক্তশশী নারীমঙ্গল সমিতি'র প্রেসিডেন্ট, তাঁরও রাত সাড়ে দশটার আগে বাড়ি ফেরা অসম্ভব। ঠাকুর-চাকর আছে, তাছাড়া বাড়ির সব ভার তো আমার হাতে।

—কেন, তোমার দাদা-টাদা নেই ?

এমিলি হাত নেড়ে বলল—দাদাও নেই, দিদিও নেই, ভাইও নেই, বোনও নেই। আমি বলতে গেলে, একেশ্বরী।

সাধারণত কোনো সুন্দরী সম্পর্কে বিচলিত হলেই দেখা যায় যে তার অন্তত পক্ষে একটি অতিশয় গুণ্ডা দাদা বা ভাই থাকে। আমি শালা সেদিকে খুব লাকি তো ?

আজ তাহলে উঠি। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে এমিলি বলল—কবে থেকে আরম্ভ করবেন ?

—কাল থেকেই আরম্ভ করব। বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে আরম্ভ করব।

—তাহলে তো ভালই। কাল থেকে। আমি নিজে কখনো কথার নড়চড় করি না, অন্য কেউ কথার নড়চড় করলেও আমি ভীষণ রেগে যাই কিন্তু।

—ভালো কথা।

ফিরতি পথে, কেন কে জানে, আমার বারংবার মনে হতে লাগল, এমিলি আমার, এমিলিকে আমি পেয়ে গেছি, এমিলি আমার, যেন আমার মতো দরিদ্রও ঘট ভরে সোনা পেয়েছে। দরিদ্রের ঘট ভরে সোনা পাওয়ার তুলনা বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে : দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম।

অনেকদিন ধরে ছুই আধ-বুড়িকে পড়াচ্ছিলাম, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাওয়া যাচ্ছিল। দু'জায়গাতেই জবাব দিয়ে দিলাম। এমিলিকে যত্ন করে বৈষ্ণব পদাবলী পড়াতে হবে, এখন আর আধ-বুড়ির কাছে গিয়ে কে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে।

বৈষ্ণব পদাবলী; ৩২।৫৪-এক সাধুবাবা রোড; এমিলি— তাছাড়া আর সব কিছু নস্যাৎ করে দিলাম।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। দেখতে-দেখতে মাস প্রায় কাবার হয়ে এল। এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া এমিলির সামনে আর কোনো কথা উচ্চারণ করিনি। আমার মন বলছে, এই রাস্তাতেই কিস্তিমাৎ হবে।

জানো, চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের পদাবলী দিনরাত আস্বাদন করতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সদর দরজা বন্ধ করে সারারাত গান হতো। আদিযুগের প্রধান কবি চণ্ডীদাস আব বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির রাধা, আহা! বিদ্যাপতির রাধা বলেছেন—হে কৃষ্ণ, তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, তার চেয়েও বেশি, তুমি আমার কাছে পাখির পাখা, তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল, মাছের কাছে যেমন জল আমার কাছে তেমনি তুমি, তোমাকে আমি সর্বস্ব দিয়েছি, কিন্তু, মাধব তুহুঁ কৈছে কহবি মোয়, আমার সর্বস্ব দিয়েও আমি তোমাকে চিনতে পারিনি, মাধব বলো, তুমি কে এবং কেমন।

পড়াতে পড়াতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছি যে, এমিলি আর সামলাতে পারেনি, আঁচল দিয়ে ঘন ঘন চোখের জল মুছেছে। ভাবগতিক যা দেখছি বোধ হয় আমাকে সর্বস্ব না দিয়ে পারবে না।

আট রকম নায়িকার কথা অলরেডি বলা হয়ে গেছে: অভিসারিকা; বাসকসজ্জা; উৎকণ্ঠিতা; বিপ্রলব্ধা; খণ্ডিতা; কলহান্তরিতা; প্রোষিতভর্তৃকা; স্বাধীনভর্তৃকা। আস্তে আস্তে এগোতে হবে। চৌষট্টি নায়িকার কথা পরে বললেও চলবে।

—সখি! কথা না রাখতে পারলে বড় লজ্জা। যা হবার

হোক, সব আমি মেনে নেব, মনকে আজ সাহস দিলাম। নিজের অহিত হবে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কিন্তু মন যে মানে না। আপন অহিত লেখ কহইত পরতেখ হৃদয় না পারিস ওর।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ক্রটি আছে। যদি নিয়ম থাকত এবং খোল বাজাতে বাজাতে পড়াতে পারতাম, এসব জটিল বস্তু এমিলির কাছে চোখের পলকে তরল হয়ে যেত। আহা, সরল মেয়ে, পদাবলীর জটিল তত্ত্ব বুঝতে হয়তো গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু নিজের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। হবে। হবে, শেষ পর্যন্ত না হয়ে পারবে না। আস্তে আস্তে হোক, অত তাড়া কিসের।

—রাধার মান বড়ো দুর্জয়। একবার তো মানের চেয়েও রাগ বেশি হয়ে গেল।

—কার উপর রাগ ?

—কৃষ্ণ ছাড়া আর রাগ করার ধন জগতে কোথায় আছে বলো। রাগ করে ঠিক করল কৃষ্ণের গায়ের রঙ নিজের চোখে আর দেখবে না, প্রাণপণে রাধা কালো রঙ এড়িয়ে চলবে। প্রেমিকার রাগ বড়ো সাংঘাতিক। রাধার সুন্দর চিবুকে একটি কালো তিল ছিল, তৃণের ডগায় চন্দন লাগিয়ে সেই কালো তিলটি ঢেকে ফেলল। আকাশের মেঘের রঙ কৃষ্ণের গায়ের রঙের মতো, রাধা চাঁদোয়া খাটিয়ে নিল, মেঘ আর চোখে পড়বে না। কালো রঙের সখিদের রাধা আর ধারে কাছে আসতে দেয় না।

—কী সাংঘাতিক রাগ রে বাবা।

—আরো আছে। সমস্ত তমালগাছ চুন লাগিয়ে রাধা শাদা করেছে। কালো ভ্রমরের ভয়ে পালিয়ে যায় চাঁপাতলায়। নিজের কালো চুলের ছায়া দর্পণে দেখে—না, নিজের মাথা ন্যাড়া করে ফেলেনি—আছাড় মেরে দর্পণ টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

নিশ্বাস নেবার জন্য আমি একটু থেমেছি, সেই মুহূর্তে এমিলি একখানা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিল। সরাসরি প্রেমপত্র নাকি ? কেল্লা ফতে হয়ে গেল ? তাড়াতাড়ি খাম খুলে ফেললাম

—দশ টাকার কুড়িখানা নোট, আমার প্রথম মাসের মাইনে।

সত্যি বলছি, খুব দুঃখ পাইনি। এ-দুঃখ আমি সামলে উঠতে পারব।

অত তাড়া কিসের।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে—পদাবলী সাহিত্য সমানে চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু যথেষ্ট ভরসা পাচ্ছি, এমিলির চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরোত্তর আমার আশা বাড়ছে—এমিলিকে শ্রীরাধার প্রেম ও প্রসাধন বিষয়ে সজাগ করে বলতে লাগলাম—শ্রীরাধা প্রসাধন করছিলেন, বুকে চন্দন ও চোখে কাজল লাগাচ্ছিলেন, এমন সময় শুনতে পেলেন যে, মাধব তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবেন। প্রসাধন শেষ না করেই রাধা বাড়ির দেউড়িতে এসে পায়চারি করতে লাগলেন। বুকের একদিক চন্দনচর্চিত, আরেকদিক খালি; যেন তুষারমণ্ডিত হিমালয় আর স্বর্ণবর্ণ পর্বত—উভয়েই শ্রীরাধার কোলে মিলিত। শ্রীরাধার ডান চোখে কাজল; বাঁ চোখ খালি। এক পয়োধর চন্দন লেপিত আর পয়োধর গোর। হিম ধরাধর কনক ভূধর কোলে মিলল জোর। মাধব, তুয়া দরশন কাজে। আধ পদ চালন কবত সুন্দরী বাহির দেহলি মাঝে। ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম। নীল ধবল কমল যুগলে···

হঠাৎ এমিলির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি থেমে গেলাম। এমিলির চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো যেন দেরাজের মধ্যে রিভলবার আছে এবং আমি এই মুহূর্তে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলতে না পারলে এমিলি রিভলবার বের করে আমাকে গুলি করবে।

প্রাণভয়ে এমিলিকে জড়িয়ে ধরে আমি গুনেগেঁথে পাঁচটি চুমু খেলাম। বাস্তবিক, এমিলির লিপস্টিক স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। স্বপ্নেও কল্পনা করিনি যে ইহজন্মে কোনোদিন অমন চমৎকার লিপস্টিক খেতে পারব।

পরমুহূর্তে এমিলির চোখের দিকে তাকিয়ে আবার আমাকে দিশেহারা হতে হলো। মেয়েদের চোখের ভাষা বোঝে কার

বাপের সাধ্য—পলকে পলকে রঙ বদলায়। এমিলির মুখখানা গনগন করছে, দু-চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে, গলা থেকে রিভলবারের গুলির মতো ছয়টি শব্দ বের হলো—আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না।

গুলিতে মারা না গেলে সঙ্গে সঙ্গে পালাতে হয়। আমিও সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এলাম, হনহন করে একেবারে বড়ো রাস্তায়, বাসে উঠে পড়লাম।

৩২।৫৪-এফ সাধুবাবা রোডে আর কখনো আসা যাবে না, কিন্তু আমার যে এক সপ্তাহের মাইনে পড়ে রইল, হিসেব করলে পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে, সেটা পাওয়া না গেলে তো আমার বিপুল লোকসান। একান্তই না পাওয়া গেলে আমাকে ওই টাকাটা চুমুর দাম হিসেবে ধরে নিতে হবে। চুমু অমূল্য বস্তু, কে না জানে, কিন্তু এখানে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমাকে একটু জমা-খরচ মেলাতে হচ্ছে। তাহলে, ধরুন, ঐকিক নিয়মে একেকটি চুমুর দাম দশ টাকা পড়ে যায়। বাজার অগ্নিমূল্য, কিন্তু একটা চুমুর দাম কিছুতেই অত হতে পারে না। আমাকে ভালোমানুষ পেয়ে এমিলি কি অতদূর ঠকাবে ?

তিন দিন পর্যন্ত নির্ভয়ে ছিলাম। হয়তো লিপস্টিকে কোনো বলবর্ধক ওষুধ মেশানো ছিল, হয়তো তিন দিন পর্যন্ত ওষুধের জোর আমাকে সতেজ রেখেছে, তারপর আস্তে আস্তে ওষুধের জোর কমে আসছে, আমিও নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি।

কানের কাছে অবিরল রিভলবারের গুলির মতো শব্দ পাই, আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না। আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না। আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না।

ঠিকমতো খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না, আপিসের কাজে এত বেশি ভুল হতে লাগল যে বড়বাবু আমার টেবিল থেকে সমস্ত

ফাইল-টাইল সরিয়ে নিলেন।

ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি, ভীষণ ভয় পাই।

এমিলির বাবা যদি গুণ্ডা লেলিয়ে দেন? অথবা, অন্যরকমও হতে পারে। উনি বিজনেসম্যান এবং হাই সার্কেলে ঘোরাঘুরি করেন, বিজনেসম্যান আর হাই সারকেলের অসাধ্য কিছু নেই, উনি কলকাঠি নেড়ে দিলে গোয়েন্দা দপ্তর অক্লেশে আপিসে আমার নামে গোপন রিপোর্ট পাঠিয়ে আমার চাকরিটি লোপাট করে দিতে পারেন। হায় গেল!

এমিলির মা-ও তো শুনেছিলাম কোন এক নারীমঙ্গল সমিতির প্রেসিডেন্ট। তাঁকেও তো অবহেলা করতে পারি না। হাজার তিনেক মহিলা নিয়ে নিশান উড়িয়ে আমাদের আপিসে চলে এলে ওঁকে ঠেকাচ্ছে কে। আমার চাকরি বাঁচানোর জন্য তিন হাজার মহিলার সম্মিলিত দাবি উপেক্ষা করবেন, আমার বড়সাহেব তেমন কাপুরুষ নন। তাহলেও তো আমার হয়ে গেল।

এমিলির চোখের ভাষায় বিভ্রান্ত না হয়ে যদি নিউ মার্কেট থেকে একটা দামী লিপস্টিক কিনে নিতাম তো বহুদিন বসে ইচ্ছা হলে মহাসুখে খেতে পারতাম এবং এতসব ঝামেলায় পড়তে হতো না।

আঃ, কানের কাছে আবার রিভলবারের গুলির মতো শব্দ শুনতে পাচ্ছি: আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না। আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না। আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না।

দু-একদিনের ব্যাপার নয়, চিন্তা-ভাবনায় যখন আধমরার বেশি হয়ে আছি, তখন বড়বাবু একদিন হাঁক দিয়ে আমাকে ডেকে বললেন—আপনার টেলিফোন।

আপিসে আমাকে কে টেলিফোন করে! এমিলি নাকি? আমাকে আবার যেতে বলবে ৩২।৫৪-এফ সাধুবাবা রোডে? মনে হয় না। নিজের কথার নড়চড় করার মতো মেয়ে, যতদূর জানি, এমিলি তো নয়।

আর এমিলি যেতে বললেও আমি আর ওখানে যাচ্ছি না। রিভলবারের গুলির শব্দ এখনো আমার হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে আছে: আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না। আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবেন না।

তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিফোন ধরলাম—হ্যালো।

অন্য প্রান্ত থেকে এমিলির স্পষ্ট গলা শুনতে পেলাম—বাবাকে বলে-কয়ে······

ইস, কী সব্বনেশে মেয়ে, চুমুর কথা কেউ কখনো নিজের বাবাকে বলে!

এমিলি বলে যেতে লাগল—বাড়ি বদল করেছি। আমাদের নতুন বাড়ির ঠিকানা: পি-৭৮ মধুপুর পার্ক।

—

হরিতকী ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত

দিন নেই রাত নেই কেবল সরযূর কথা মনে আসে। কবে সরযূ ঘরে আসে কে জানে। বাসুদেবের কিছু ভালো লাগে না। একেক সময় ইচ্ছা করে সব ছেড়ে-ছুড়ে বিবাগী হয়ে কোথাও চলে যায়।

অথচ, আশ্চর্য কাণ্ড, সরযূকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখেনি বাসুদেব। কেবল সরযূর নাম শুনেছে, সরযূর রূপগুণের বর্ণনা শুনেছে। নিজের মায়ের মুখেই শুনেছে।

বাসুদেবের মা থাকেন দিল্লীতে, দাদার কাছে। সংসারে ওই মা আর দাদা-বৌদি ছাড়া বাসুদেবের আর কেউ নেই। মানে, এখন পর্যন্ত আর কেউ নেই। সরযূ তো এখনো ঘরে আসেনি।

যতক্ষণ ঘরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সরযূ বাসুদেবের কেউ নয়। আইন বজায় রেখে কথা বলতে হবে তো। সরযূ কে? না, বনবিহারীবাবুর মেয়ে, শ্যামনগরে থাকে। ব্যস, ওই পর্যন্ত।

কথাটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া ভালো, সরযূকে বাসুদেবের মা আর দাদা দেখেশুনে পছন্দ করে রেখে গেছেন। ঠিকুজি-কুষ্টিও মিলে গেছে। দেনা-পাওনাতেও কোনো গরমিল নেই। দু-পক্ষই রাজি।

পছন্দ করে দিয়ে মা আর দাদা-বৌদি দিল্লী চলে গেছেন। বাসুদেব যেমন ছিল তেমনি আছে, কৃষ্ণ হালদার লেনের একটা মেসে। চার হাত এখন এক হয়ে গেলেই হয়।

কিসে আটকাচ্ছে জানেন?

একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে ফুটি-ফুটি করেও বাসুদেবের বিয়ের ফুল ফুটছে না। ভুক্তভোগী ছাড়া এ-দুঃখের মর্ম আর কে জানে।

যাবার আগে মা বাসুদেবকে বলে গেছেন—নে, দেখেশুনে একটা ঘরভাড়া কর। তারপর দিন-তারিখ ঠিক করে এসে শুভকর্ম সেরে চলে যাব। তুই আর বৌ থাকবি, দু-খানা ঘর হলেই তোদের হেসে-খেলে চলে যাবে।

তখন বাসুদেব ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে, ঘরের অভাবে তাকে হাহাকার করে মরতে হবে।

তারপর মেয়ের গুণ-যোগ্যতার বিষয়েও মা দু-কথা বলেছেন—দেখিস, সরযূকে তোর খুব পছন্দ হবে। লক্ষ্মী মেয়ে। আজ-কালকার মেয়েদের মতো নয়। দেবদ্বিজে ভক্তি আছে। কত ভক্তি করে আমার আর তোর দাদার পায়ের ধুলো নিলে। তারপর দু-খানা কেত্তন গেয়ে শোনালে, কানে এখনো লেগে আছে।

খাটে শুয়ে দাদা তখন পা নাচাচ্ছিলেন। নাচন থামিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল মটকে দাদা উদাস গলায় বললেন—তুমি ভুল শুনেছ মা। ওটা কেত্তন নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত।

মা কোনো আপত্তি করলেন না। বললেন—তা হবে। মোটকথা আমার কানে এখনো লেগে আছে। বেয়াই তো মেয়েকে একটা হারমোনিয়ামও দেবেন বলেছেন। তা তুই যে কিছু জানিস না, নইলে ওই সঙ্গে তোর জন্যেও একজোড়া তবলা-ডুগি চেয়ে নিতাম।

নিজের বিয়ের বিষয়ে কথা হচ্ছে, বাসুদেব মুখ নীচু করে রইল। বাসুদেব আজকালকার ছেলেদের মতো বেহায়া নয়। মুখ নীচু করে বাসুদেব মনে মনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি কলি গুনগুন করতে লাগল: 'সুমঙ্গলী বধূ, সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু।' আহা!

তারপর মা আর দাদা তো কবে দিল্লী চলে গেছেন। এদিকে বাসুদেবের প্রাণ যে যায় যায়। কোথাও ঘরভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শেষকালে কি ঘরের অভাবে সরযূ স্নেহমধু।' আহা!

রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীত। বাসুদেব রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য বরাবর তৃষিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত পারদর্শিনী

একটি মেয়ে বাসুদেবের ঘরে আসতে গিয়েও…নাঃ, বাসুদেব পাগল হয়ে যাবে।

আচ্ছা, সরযূ কি সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে? না, তা কেমন করে হয়। অন্তত বাসুদেবের যেগুলো পছন্দ, সেগুলো নির্ঘাত সরযূর কণ্ঠস্থ। যেমন, ধরুন: এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—এ যে হৃদয়দহনজ্বালা সখী। এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি। শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান। আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে। কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে।

বিয়ের পর বাসুদেব আপিস থেকে ফিরে এসে চা-জলখাবার খেয়ে গান শুনতে বসে পড়বে। সরযূ গাইবে, বাসুদেব শুনবে। শুনতে শুনতে বাসুদেবের প্রাণে সুরের আগুন জ্বলে উঠবে।

সেদিনের কথা ভেবে মেসের খাটে শুয়ে বাসুদেব মাঝ রাত্রে গুনগুন করে উঠল: তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।

ভালোবেসে বাসুদেবের গলা ক্রমশ চড়া হতে লাগলো। আরো চড়া। আরো।

পাশের সাটে অকাতরে ঘুমোচ্ছিলেন পরাশর রাহা। ঘুম ভেঙে গেল। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে?

নিজের খাটে একটা ঘুষি মেরে পরাশর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—আপনি চুপ করবেন মশাই? শান্তিতে একটু ঘুমোতে দেবেন? নাকি ফায়ার ব্রিগেডে টেলিফোন করব? এই মাঝ রাত্তিরে আমি আপনার সুরের আগুনের নিকুচি করি।

এইরকম ঝামেলায় ভূ-ভারতে কখনো কোনো মেয়ের বাপ বোধহয় পড়েনি। বনবিহারীবাবু আপন মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যার যা কপাল। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে যদি বা একটা চলনসই পাত্র জোগাড় করা গেল, পাত্র ঘর পাচ্ছে না বলে সরযূকে এখনো

সাতপাক ঘুরিয়ে দেওয়া গেল না।

কপাল, কপাল, সবই কপাল। তা না হলে সরযূর মতো মেয়েকে একটা কেরানীর হাতে তুলে দিতে হচ্ছে! দায়-দায়িত্ব না থাকুক, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট না থাকুক, বাসুদেব একটা কেরানী তো বটে।

কিন্তু সরযূ? সোনার প্রতিমা। কী রঙ, কী মুখ-চোখ, কী হাঁটন-চলন। তারপর গুণের দিকটাও বিবেচনা করার মতো বস্তু। সেলাই-ফোঁড়াইতে ঠিক কার মতো বনবিহারীবাবু এই মুহূর্তে বলতে পারছেন না, কিন্তু রান্নায় দ্রৌপদীর মতো, সেবা-শুশ্রূষায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো, ভক্তিতে মূর্তিমতী সিস্টার নিবেদিতা। রবীন্দ্রসঙ্গীত?. কারো সঙ্গে তুলনা দেবার দরকার নেই, মোট কথা সরযূর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত মানুষের একবার শুনে আশ মেটে না, প্রত্যেক দুপুরে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে ডাকাডাকি পড়ে যায়।

যাক, যার যেমন কপাল। বনবিহারী মনে মনে বললেন: মা, তুই আমার মতো ছা-পোষা মানুষের মেয়ে হয়ে কেন এই পৃথিবীতে এলি? তেমন ঘরে জন্মালে তোর যে হাইকোর্টের জজের সঙ্গে বিয়ে হতো। যদি দানসামগ্রী বাবদ বরকে গাড়ি-ফ্রিজ-রেডিওগ্রাম দিতে পারতাম তো তোর জন্য যে গণ্ডায়-গণ্ডায় সেক্রেটারি—জয়েন্ট সেক্রেটারি লাইন দিত।

যা হবার নয় তা নিয়ে হাহাকার করে আর লাভ কি। যেটা জুটেছে, সেটার সঙ্গে তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেও বনবিহারীবাবু কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেতে পারেন। বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারেন।

বাসুদেব কোনো কাজের নয়। উদ্যোগী হলে একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না? নিশ্চয় যায়। গাদা-গাদা মানুষ তা হলে পাচ্ছে কী করে। হোপলেস। গুড ফর নাথিং। হবু শ্বশুর হয়ে বনবিহারীবাবুকেই দিগ্বিদিকে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। উপায় কি, বাড়ির অভাবে যে সরযূর বিয়ে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।

হত্তুকিবাগানে একতলায় দু-খানা ঘরের খোঁজ পেয়েছেন

বনবিহারীবাবু। দিনকয়েক হলো ডান হাঁটুটা আবার ফুলে উঠেছে, পুরোনো বাতের ব্যথা, ছুটোছুটি করলে আরো বেড়ে যাবে। অগত্যা বাসুদেবের আপিসে টেলিফোন করলেন। টেলিফোনে হত্তুকিবাগানের ঠিকানা দিলেন। বললেন—নিজে যাও। বাড়ির কর্তাকে ধরে-টরে যা হোক করে কাজ হাঁসিল করো। খুব বিনয়-টিনয় করে কথা কইবে, বুঝলে ?

আপিস ছুটির পব সেদিনই বাসুদেব হত্তুকিবাগানে গেল, খুঁজে খুঁজে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলো।

দোতলা বাড়ি। বাড়ির মালিক একজন কবিবাজ। সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো অক্ষবে লেখা আছেঃ কবিরাজ শ্রীরাধাবমণ গুপ্ত, ভিষগাচার্য, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত।

ঔষধালয়েই বসেছিলেন কবরেজমশাই। বাসুদেব নমস্কার করে দাঁড়াল।

রাধারমণ বললেন—কী চাই আপনার ? বায়ু কুপিত ? না শ্লেষ্মাধিক্য ?

বিনয়ে বিগলিত হয়ে বাসুদেব বলল—আজ্ঞে না। আমি ঘর-ভাড়ার জন্য এসেছি। ঘরভাড়া না পেলে হয়তো বায়ু কুপিত হতে পারে।

রাধারমণের মুখখানা স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন —ঘরভাডা। তাই বলুন।

খানিকক্ষণের জন্য উদাস হয়ে গেলেন রাধাবমণ কবরেজ। মনে মনে কী ভাবলেন কে জানে। জিজ্ঞেস করলেন—তা আপনার সংসাবটি কীরকম ? কত লোকজন আপনাব পবিবাবে ?

অনেক ঠেকে বাসুদেব এটুকু শিখেছে যে, এক্ষেত্রে সামান্য একটু মিথ্যে না বললে ইহজন্মে কোথাও ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে না। অগত্যা বাসুদেব বলল —আজ্ঞে, আমি আর আমার বৌ।

চশমার ফাঁক দিয়ে রাধারমণ কবরেজ এমনভাবে বাসুদেবের দিকে তাকালেন যে, বাসুদেবের একটু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। রাধারমণ জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেপিলে ? আপনার কোনো

ছেলেপিলে হয়নি এখনো ?

কানের ডগা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল বাসুদেবের। বলল—আজ্ঞে না, এখনো হয়নি কিছু।

তা কথাটা একবিন্দু মিথ্যে নয়।

রাধারমণ উঠলেন। তালা খুলে ঘর-টর দেখালেন বাসুদেবকে। দু-খানা ঘর, একফালি বারান্দা, আলাদা কিচেন-বাথরুম। চমৎকার। ভাড়া কত হবে ?

—ষাট টাকা।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না বাসুদেব। ষাট টাকা! মাত্র ষাট টাকা ভাড়া!

—আজ্ঞে, সেলামি-টেলামি লাগবে নাকি ?

—সেলামি ?—ঘরের দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে রাধারমণ আর্তনাদ করে উঠলেন—সেলামি ? আমি নেব ? জানেন, আমি প্রাচীন আর্যঋষির বংশধর ? আমার পূর্বপুরুষ আয়ুর্বেদ রচনা করেছেন ? আর আমি সেলামি নেব ? না, সেলামি আমি ছুঁই না। তবে এক বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিতে হবে। সাতশো কুড়ি টাকা। যদি রাজি থাকেন তো কালই টাকা নিয়ে চলে আসুন।

আপিসের কো-অপারেটিভ থেকে ধার করে টাকা নিয়ে রাধারমণের কাছে যেতে দেরি করল না বাসুদেব।

তারপর আর দেরি হলো না। দিল্লী থেকে মা আর দাদা-বৌদি চলে এলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে শুভবিবাহ হয়ে গেল। মা আর দাদা-বৌদি আবার চলে গেলেন দিল্লীতে। এতকালের মেস ছেড়ে দিয়ে বাসুদেব চলে এল হতুকিবাগানে। নতুন সংসার। ঝামেলা নেই। স্বামী আর স্ত্রী। ওদিকে বাসুদেবের মেসের সীট খালি রইল না, সেখানে যাঁর জায়গা হলো তাঁর নাম সুরঞ্জন গোস্বামী, কোষ্ঠকাঠিন্যের চিররুগী সুরঞ্জন। কিন্তু এ-গল্পের সঙ্গে চিররুগী সুরঞ্জনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আপিস থেকে বাড়িতে ফিরে নতুন বৌয়ের সঙ্গে নির্ঝঞ্ঝাটে

দু-চারটে কথাবার্তা কইবে, বিধাতা বাসুদেবের কপালে বুঝি সে-সুখ লেখেননি। অথচ অসামান্য কোনো ঘটনা নয়। প্রথম দিন দু-চার কথা হতে-না-হতেই মাথার উপরে সুরু হয়ে গেল ঘদাং-ঘদাং-ঘদাং। বিপুল বিক্রমে হামানদিস্তা চলছে।

তা কবরেজের বাড়ি যখন, হামানদিস্তা তো চলবেই।

তক্ষুনি একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য উপরে উঠতে যাচ্ছিল বাসুদেব, কিন্তু গেল না; প্রথম দিনেই ঝগড়া-বিবাদ ভালো নয়। যাক দেখি দু-একদিন। আপাতত এই বাধাবিঘ্নের মধ্যেই যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ করা যায়। যেটুকু বলা-কওয়া হয়।

কথায় কথায় সরযূ মিটমিট করে বলল—জানো, আমার বাবা যদি খুব স্ট্রিক্ট না হতেন তাহলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতো না।

—মানে?

—একজন নয়, দুজন নয়, সাতজন বাঘা-বাঘা ওয়েল কোয়ালিফায়েড লোক আমাকে প্রপোজ করেছিল। দু-জন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন মার্কেন্টাইল ফার্মের অফিসার আর তিনজন গেজেটেড অফিসার।

বাসুদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—একসঙ্গে সাতজন? কোরাসে প্রপোজ করেছিল?

সরযূ না হেসে পারল না। বলল—বাঃ, এক সঙ্গে কেন। ওয়ান বাই ওয়ান। কিন্তু আমি সকলকে রিফিউজ করে দিলাম। অন্য কোনো মেয়ে হলে লাফিয়ে পড়ত, পারলে তো একসঙ্গে সাতজনকে বিয়ে করে ফেলত, কিন্তু আমি বাপু ওরকম বেহায়া নই, বাবার মতো স্ট্রিক্ট ক্যারেকটার আমার। বাবা যেখানে আমার বিয়ে দেবেন, সেখানেই আমার স্বর্গ।

বাসুদেব কৃতার্থ হয়ে গেল। সাতজন ধনুর্ধরকে রিফিউজ করে সরযূ এসেছে বাসুদেবের বৌ হয়ে। বাসুদেব গর্ব করতে পারে বৈকি।

—নিজের মুখে নিজের কথা বলতে ভালো লাগে না, তবু

বলি—আবার অন্যদিকে চলে এল সরযূ—আমার গোরাদা বলেন, আচ্ছা, গোরাদার গলা তোমার কেমন লাগে?

বাসুদেব ঢোঁক গিলে বলল—গোরাদা কে?

গালে হাত দিয়ে ভুরু উঁচু করে সরযূ বলল—ও মা, তুমি আমার গোরাদার নামও জানো না? তুমি কী গো। আমার গোরাদার কত নামডাক, অমন রবীন্দ্রসঙ্গীত ক'জন গাইতে পারে। পুরো নাম হলো গোরচাঁদ সেন। এতক্ষণে বাসুদেব বুঝতে পারল। হুঁ। জিজ্ঞেস করল—তা উনি তোমার কীরকম দাদা?

—যাঃ, সত্যি-সত্যি দাদা হবেন কেন। উনি তো আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাস্টার।

বাসুদেব জিজ্ঞেস করল—তা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাস্টারকে বুঝি 'দাদা' বলে?

ঠোঁট উল্টে সরযূ বলল—আমি একা 'দাদা' বলি নাকি? রত্না, বনশ্রী, অমলা, শিবানী—সকলেই তো 'গোরাদা' বলে ডাকে। তা গানের মাস্টারকে 'দাদা' না বলে কী বলবে—মেসোমশাই? নাকি কাকাবাবু? তোমার যেমন কথা।

আরেকটা কথা বলার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাসুদেবের, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। কোমরের বিষয়ে একটা কথা। সরযূর কোমরের দিকটা প্রায় সাত সেন্টিমিটার ফাঁকা পড়ে আছে। আপিস-টাপিসে মেয়েদের প্রচুর ফাঁকা কোমর দেখা যাচ্ছে আজকাল, বাসুদেব স্বচক্ষে দেখেছে, বাড়িতে এসে নিজের বৌয়ের কোমরের সেইরকম দীনদশা দেখলে স্বামীর মনে বড়ো দুঃখ হয়, মনে ধিক্কার আসে—আমি কি এতই নরাধম যে ব্লাউজের ওটুকু বাড়তি কাপড়ের দাম দিতে পারি না!

কিন্তু প্রথমেই কোমরের কথা থাক। সময় মতো পরে না হয় একদিন কায়দা করে বলা যাবে। আজ বরং গলা নিয়ে এক লাইন বলা যেতে পারে।

বাসুদেব সাহস করে বলে ফেলল—আচ্ছা, ব্লাউজের গলা আরেকটু ছোটো করতে পারো না, অত গলা খুলে লাভ

কি, সরযূ ?

সরযূর চোখ ছলছল করে উঠল। বলল—তুমি কি আমাকে আমার গোরাদার কথা অমান্য করতে বলছ? আমার গোরাদা আমাকে বারবার বলেছেন, 'সরযূ, যত পারো গলা খুলে গাইবে।'

গলা নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করতে পারল না বাসুদেব। বলল—থাক, চোখ মুছে ফেলো। তোমার গোরাদার আরো দু-চারটে কথা বলো না, শুনে রাখি।

বাঁ-হাত দিয়ে চোখ মুছে ফেলল সরযূ। বলল—আমার গোরাদার একটা কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

—বলে যাও।

—জানো, আমার গোরাদা আমাকে কতদিন বলেছেন, 'সরযূ, আমার অন্যান্য ছাত্রীরা যদি তোমার মতো হতো তাহলে আমার আর কোনো দুঃখ থাকত না। কত কঠিন কঠিন গান তুমি কেমন টপ-টপ রপ্ত করে ফেলো।' কাল থেকে রোজ সন্ধ্যায় আমি তোমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাব, অ্যাঁ ?

আনন্দে সরযূর দু-হাত জড়িয়ে ধরল বাসুদেব। তাহলে এই কথাই রইল। কাল থেকে। সন্ধ্যেবেলায়। নিয়মিত। রবীন্দ্র-সঙ্গীত। সরযূ গাইবে। বাসুদেব শুনবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। বাসুদেব আর সরযূ মুখোমুখি। হারমোনিয়ামে হাত লাগালো সরযূ, রবীন্দ্রসঙ্গীত আরম্ভ হয়-হয়, সেই সময়েই ঠিক উপরতলায় আরম্ভ হয়ে গেল হামানদিস্তার ঘদাং-ঘদাং-ঘদাং। আর হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

খুব করুণ মুখে বাসুদেবের দিকে তাকালো সরযূ।

বাসুদেবের মাথার মধ্যে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। বলা-কওয়া নেই বাসুদেব সিঁড়ি বেয়ে একটানে দোতলায় উঠে গেল। রাধারমণ কবরেজ স্বহস্তে হামানদিস্তা চালাচ্ছেন।

বাসুদেবকে দেখে রাধারমণ কবরেজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন

না। পরম শান্ত গলায় বললেন, অত ছুটতে ছুটতে কি উপরে উঠতে আছে। ওতে হৃদযন্ত্রে বড়ো চোট লাগে। আস্তে, বাসুদেববাবু, আস্তে।

বাসুদেব তখনো হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আপনার এই হামানদিস্তা কি রোজ সন্ধ্যায় চলবে?

স্মিতহাস্যে রাধারমণ কবরেজ বললেন—রোজ। সন্ধ্যে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। কোনো কোনো সময়ে অহোরাত্র। যত ভাড়াটে আসে, সকলেরই দেখি এই এক প্রশ্ন, আমার এই হামানদিস্তার উপর সকলের যত রাগ। আগাম ভাড়া লোকসান দিয়েও এই হামানদিস্তার জন্যে ভাড়াটের পর ভাড়াটে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কোথায় যে যায়, কে জানে।

ঘদাং-ঘদাং-ঘদাং।

অল্প ভাড়ার রহস্য এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। বাসুদেব রুক্ষ গলায় বলল—আগে আপনি একথা বলেননি কেন?

—বাঃ, কবরেজের বাড়িতে হামানদিস্তা চলবে, এ কি আগে বলবার মতো একটা কথা হলো?

ঘদাং-ঘদাং-ঘদাং।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। আপ্যায়ন করে রাধারমণ কবরেজ বললেন—হামানদিস্তায় কি চূর্ণ হচ্ছে জানেন? হরিতকী। প্রত্যেক দিন বিস্তর হরিতকী চূর্ণ না করলে আমার শান্তি নেই।

বাসুদেবের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—হর্তুকি তো শুনেছি কনস্টিপেশনের ওষুধ। আপনার কি খালি কনস্টিপেশনের রুগী?

যেন বাসুদেবের মূর্খতায় খুব দুঃখ পেয়েছেন এমনি একটা ভঙ্গি করলেন রাধারমণ কবরেজ। বললেন—ওই এক কথাই কেবল শিখে রেখেছেন। বহু অসুখেই হরিতকী লাগে। হরিতকীর কোনো তুলনা-নেই। কেবল হরিতকী নিয়েই একখানা মহাভারত হতে পারে। আহা দাঁড়িয়ে আছেন কেন এখনো, বসুন, বসে পড়ুন।

বসতে হলো বাসুদেবকে। রাধারমণ কবরেজ বললেন—শুনুন।

হরিতকীর মজ্জায় মধুর রস, স্নায়ুতে অম্লরস, বৃন্তে তিক্তরস, ত্বকে কটুরস, অস্থিতে কষায় রস। গৃহে যেমন সুগৃহিণী, উদরে তেমনি হরিতকী। হরিতকী উষ্ণবীর্য, মঙ্গলজনক, দোষের অনুলোমক, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, আয়ুর হিতকর, পুষ্টিজনক, উপাদেয়, বয়ঃস্থাপক, সর্বরোগপ্রশমক এবং বুদ্ধিন্দ্রিয়ের বলকারক। একতোলা পরিমাণ হরতকীচূর্ণ এবং একতোলা পরিমাণ অনুপান একত্র করে খান, সকল অসুখ সেরে যাবে। সকল বোগ হরণ কবে বলেই তো হরিতকী, হরয়েৎ সর্বরোগংশ্চ তেন প্রোক্তা হবিতকী। আরো শুনবেন ?

ঘদাং-ঘদাং-ঘদাং কিন্তু সমানে চলছে।

বাসুদেব এখন সরযূর রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া কিছুই শুনতে চায় না—হরিতকীর গুনব্যাখ্যাও নয়, হামানদিস্তার ঘদাং-ঘদাং-ঘদাংও নয়।

রাধারমণ কবরেজ তন্ময় হয়ে হাত ও মুখ চালিয়ে যেতে লাগলেন—যিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, বলহীন, রুক্ষশরীর, কৃশ, উপবাসী বা পিত্তপ্রবল, তিনি কিন্তু হরিতকী খেলে ভালো হবে না। রক্তস্রাব হলে তাকে হরিতকী দেবেন না। আর মনে বাখবেন, আপনি বিশেষভাবে মনে বাখবেন গর্ভবতী রমণীমাত্রেরই হরিতকী ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মনে রাখবেন তো ?

হামানদিস্তার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে বইল বাসুদেব। চোখেব পলকে ওটা কেড়ে নিয়ে দোতলা থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেললে কেমন হয় ? না, অসম্ভব। বিশাল হামানদিস্তা, ওজন আছে। ওটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে হয়তো বাসুদেব নিজেই পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, সরযূ বিধবা হয়ে যাবে, বাসুদেবের আব ইহজন্মে সধবা সরযূর মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা হবে না।

—ক-রকম হরিতকী আছে, জানেন ?

বাসুদেব ঘাড় নেড়ে জনাল—না।

—সাত রকম। বিজয়া, রোহিণী, পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। সব রোগেই বিজয়া প্রশস্ত। রোহিণী

ব্রণবিনাশকারী। পুতনা প্রলেপে উপকারী। চক্ষুরোগে অভয়া। চেতকী চূর্ণে প্রশস্ত। ক-রকম চেতকী আছে বলুন তো শুনি।

বাসুদেব আবার ঘাড় নাড়ল। জাহান্নামে যাক চেতকী। এই হামানদিস্তাকে সঙ্গে নিয়ে যাক।

ঘদাং-ঘদাং-ঘদাং।

আহা চেতকীর কথা কিছুই জানে না বাসুদেব। খুব দুঃখের কথা। রাধারমণ কবরেজ আবার আরম্ভ করলেন—দু-রকম চেতকী আছে, শুক্লবর্ণ আর কৃষ্ণবর্ণ। চেতকী হরিতকী গাছের ছায়ায় কেউ যাওয়া-আসা করুক, সঙ্গে-সঙ্গে তার ভেদ আরম্ভ হয়ে যাবে। চেতকী হরিতকী কেউ হাতে করে রাখুক, যতক্ষণ হাতে থাকবে ততক্ষণ ভেদ, হাত থেকে ফেলে দিক, সঙ্গে সঙ্গে ভেদ বন্ধ।

হরিতকীর রূপগুণের বর্ণনা কি কিছুতেই শেষ হবার নয়? এতক্ষণ তবু বাঙলায় হচ্ছিল, এবার রাধারমণ কবরেজ গড়গড় করে সংস্কৃত আওড়াতে লাগলেন—দক্ষং প্রজাপতিং স্বস্থমশ্বিনৌ বাক্যমূচতুঃ। কুতো হরিতকী জাতা তস্যাস্তু কতি জাতয়ঃ॥ রসাঃ কতি সমাখ্যাতাঃ কতি চোপরসাঃ স্মৃতাঃ! নামানি কতি চোক্তানি কিং বা তাসাঞ্চ লক্ষণং॥ না, না, ভয় পাবেন না। আমি তো আছি। সংস্কৃত কি সকলে বোঝে? শুনুন। বাঙলা করে দিচ্ছি।

বাসুদেব আর্তনাদ করে উঠল—বাঙলা করতে হবে না। আমি বুঝে নিয়েছি।

হামানদিস্তা একবিন্দু না থামিয়ে রাধারমণ কবরেজ বললেন—বেশ, তাহলে আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

বাসুদেব নিরুপায় হয়ে বলল—না, থাক, আপনিই বাঙলা করে বলুন।

—হ্যাঁ। শুনে রাখুন কাজে লাগবে। একদা সুখে উপবিষ্ট দক্ষ প্রজাপতিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জিজ্ঞেস করলেন, 'ভগবন্! হরিতকীর কথা সবিস্তারে বলুন। আপনিই সেকথা বলার একমাত্র উপযুক্ত, অতএব জীবের উপকারের জন্য আপনিই তা যথাযথ বর্ণনা

করুন।' দক্ষ প্রজাপতি উত্তর দিলেন, 'একদা ইন্দ্র অমৃত পান করছিলেন, হঠাৎ তাঁর হাত থেকে একবিন্দু অমৃত মাটিতে পড়ে গেল। সেই অমৃতবিন্দু থেকে হরিতকীর উৎপত্তি।' হরিতকী কি সামান্য জিনিস? কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরিতকী। অর্থাৎ...বাঙলা করার আগেই, অসম্ভব কাণ্ড হলো একটা। হামানদিস্তা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল, ঘরময় ছড়িয়ে গেল হরিতকীর খণ্ড। একটা হামানদিস্তা যে এভাবে টুকরো হয়ে যেতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বাসুদেবের বিশ্বাস হতো না। উদরস্থ হরিতকী কী করে-না-করে কে জানে, কিন্তু হামানদিস্তাস্থ হরিতকী যে কুপিতা হতে পারে সে-ঘটনা তো বাসুদেব চোখের সামনে স্পষ্ট দেখল।

রাধারমণ কবরেজ হু-হু করে কেঁদে উঠলেন—আমার তিন-পুরুষের হামানদিস্তা চলে গেল, এ-জীবন বেখে আর লাভ কী। অমন সতী-সাধ্বী হামানদিস্তা কোথায় আর পাব?

বুকের মধ্যে কী আনন্দ বাসুদেবের। যাক, ভগবান আছেন। প্রায় তুড়ি দিতে-দিতে নিজেব ঘরে চলে এল বাসুদেব। সরযূ তখনো হারমোনিয়মের সামনে ছবির মতো বসে আছে।

মুখোমুখি বসে পড়ে বাসুদেব হাসতে হাসতে বলল—রবীন্দ্র-সঙ্গীত আরম্ভ করে দাও, সরযূ। কবরেজের হামানদিস্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। নির্ভয়ে চালাও তোমার রবীন্দ্রসঙ্গীত। প্রাণ ভরে শুনি।

একের পর এক সাতখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা গেল সরযূর গলায়। বৌয়ের গান সম্পর্কে স্বামীর সত্যকথা বলা অনুচিত, বললে সংসারে সুখ থাকে না, সংসারে আগুন জ্বলে যায়। শুনতে শুনতে বাসুদেবের চোখে জল এসে গেল। খানিকক্ষণ আগে রাধারমণ কবরেজের চোখের জল দেখে বাসুদেবের মনে হয়েছিল, ভগবান আছেন। এখন বাসুদেবের মনে হলো—না, ভগবান নেই।

গান শেষ করে সরযূ বলল—আজ আর থাক। কাল তোমাকে

আবাব শোনাব, অ্যাঁ ?

—হুঁ। হুঁ-হুঁ।

পবদিন আপিস থেকে ফিবে বাসুদেব নিজের ঘরে ঢুকল না, লুকিয়ে-লুকিযে সটান চলে গেল দোতলায়। রাধারমণ কবরেজ চাদব মুড়ি দিয়ে শুয়ে ফোঁসফোঁস কবছেন।

কোঁচার তলায় মস্ত এক হামানদিস্তা নিয়ে এসেছে বাসুদেব।

বাধাবমণ তডাং কবে লাফিযে উঠলেন।

বাসুদেব নীচু গলায বলল—নিন, আপনাব জন্য বাজার ঘুরে পছন্দ কবে এই হামানদিস্তা নিয়ে এসেছি। আমাব উপহার। কাল আপনাব মুখে হবিতকীব রূপগুণ শুনে বড়ো ব্যাকুল হয়েছি। হবিতকীব কথা কিছুই তো জানতাম না। বড়ো উপকাব করেছেন আপনি, আমাব চোখ খুলে দিযেছেন। এই হামানদিস্তায় আপনি ইচ্ছামতো হবিতকী চূর্ণ কবে যান। হবিতকীব জয় হোক।

বাধাবমণ কববেজেব মুখখানা হাসিতে ভবে উঠল।

নিজেব ঘবে এসে ঢুকল বাসুদেব। উপবে ততক্ষণে ঘদাং-ঘদাং-ঘদাং আবম্ভ হয়ে গেছে। হামানদিস্তাটি নিতান্ত মন্দ নয়। বাসুদেবের পছন্দ আছে।

কিন্তু এই ছেলেটি কে ?

সবযূ চা-জলখাবাব দিযেছে ছেলেটিকে। বলল--পরেশ, এই তোমাব জামাইবাবু। চেনো তো ?

গরম সিঙাডা ভাঙতে ভাঙতে পবেশ বলল---বাঃ, জামাইবাবুকে বিয়ের সময দেখেছি সবযূদি। উনিই ববং আমাকে চেনেন না।

সবযূ চিনিয়ে দিল। বলল—পবেশ। আমার পাড়াতুতো ভাই। শ্যামনগবে থাকে। কাল দুপুবে ওদেব বাডিতে যেতে হবে। ববাববই শীতকালে ওদেব বাডিতে যেতে হয়। আমার ববীন্দ্রসঙ্গীত না হলে ওর জ্যাঠাইমার চলে না।

পরেশ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল—শীতকালে যেমন আমার জ্যাঠাইমা, গ্রীষ্মকালে তেমনি গোবিন্দের পিসীমা। উনি সারাবছর আসামে থাকেন, গ্রীষ্মকালে শ্যামনগরে আসেন। গ্রীষ্মকালে

দেখবেন গোবিন্দ সরযূদিকে নিতে আসবে। সরযূদির রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া গোবিন্দের পিসীমারও চলে না।

হতভম্ব হয়ে গেল বাসুদেব। সরযূর তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মার্কেট আছে?

কাল দুপুরে সরযূ শ্যামনগরে যাবে, পরেশ এসে নিয়ে যাবে, দুপুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত সেরে আবার সন্ধ্যার আগে ফিরে আসবে—বাসুদেবের কি কোনো আপত্তি আছে? না, না, আপত্তি কিসের।

পরেশ বিদায় নিয়ে উঠল। শত হলেও শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের ছেলে, পরেশকে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে বাসুদেবও বেরিয়ে এল।

রাস্তায় নেমে বাসুদেব ফিসফিস করে পরেশকে জিজ্ঞেস করল—সরযুর রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য তোমার জ্যাঠাইমা অত ব্যাকুল কেন হে? আমাকে ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে?

পরেশ ইতস্তত করে বলল—আপনাকে প্রাইভেটলি বলতে পারি। যদি আপনি সরযূদিকে না বলে দেন।

—বলব না। বলো।

—হয়েছে কি, জ্যাঠাইমা ডালের বড়ি দেন ছাদে, কাক-চিলের জ্বালায় অস্থির, কিন্তু সরযূদি ছাদে বসে দু-খানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে এলে ছাদের ত্রিসীমানায় আর কাকচিল আসে না। সেইজন্যই তো জ্যাঠাইমা……

এতক্ষণে বাসুদেবের কাছে সব রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গোবিন্দের পিসীমা কেন?

পরেশ সে-হিসেবও পরিষ্কার করে দিল—গোবিন্দের পিসীমা যে ছাদে আমসত্ব দেন গ্রীষ্মকালে। আম গুলতে আরম্ভ করেই উনি চেঁচাতে থাকেন, 'ওরে গোবিন্দ, সরযূকে ডেকে নিয়ে আয়, ছাদে বসে দু-খানা রবীন্দ্রসঙ্গীত করে যাক, নইলে যে সব আমসত্ব কাকচিলের পেটে যাবে।'

—

মনে পড়ে গেল

বড় রাস্তার উপরে হাজরা রোড়ের মোড়ে একটি সেলুন আছে, সেখানে আমি বরাবর চুল ছাঁটাই। কীরকম একটা নেশার মতো হয়ে গেছে আমার, অন্য কোথাও চুল ছাঁটিয়ে আমার সুখ হয় না। সীতানাথের হাতে চুল ছাঁটানো চাই। সীতানাথ ওই সেলুনেই কাজ করে।

কোনোদিন কোনো অঘটন হয়নি। চিরদিন সুখ-শান্তিতে কাটবে এইরকমই তো ভেবেছি, কিন্তু একদিন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেল।

খুব সাংঘাতিক কাণ্ড।

আমি তো চেয়ারে ঘাড় গুজে চোখ বন্ধ করে (সমস্ত আয়নার সামনে আমি বরাবর চোখ বন্ধ করে থাকি।) চুপচাপ আছি, ঝড়ের বেগে সীতানাথের হাতে ক্লিপ চলছে, হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে আমি সেলুনের কাটা দরজার দিকে তাকালাম। কাটা দরজা ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে একটা ছেলে চিৎকার করে বলল—ভারতোষবাবু, আপনার বৌয়ের প্রসবব্যথা উঠেছে, আপনি এক্ষুনি বাড়ি চলে যান।

বলেই ছেলেটি উধাও হয়ে গেল।

আমি সেই মুহূর্তে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। সীতানাথ হা-হা করে উঠল, কিন্তু কে কার কথা শোনে। চোখের পলকে আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম, এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেলাম।

ভগবানের দয়া বলতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে একটি দোতলা বাস পেয়ে গেলাম। সড়সড় করে উঠে গেলাম দোতলায়। আবার ভগবানের দয়া। সচরাচর হয় না এরকম, দোতলা

একেবারে ফাঁকা। জানালার কাছে একটা পছন্দসই সীটে বসে পড়লাম। চলাও জোরসে।

'চালাও জোরসে'—মনের কথা বোধ করি মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়েছিল। দু-একজন ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে এবং তখনি আমার মনে হলো অমন 'চালাও জোরসে' বলাটা খুব ভুল হয়ে গেছে। দোতলায় তো কোনো ড্রাইভার থাকে না।

ভদ্রলোকেরা এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন যে আমি লজ্জা পেয়ে খুব উদাসীন সেজে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এলগিন রোড পার হয়ে এলাম।

আড়চোখে দেখি ভদ্রলোকেরা তখনো আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। একবার একটা ভুল কথা বলে ফেলেছি বলে আমার দিকে ক্রমাগত তাকিয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। না, ভদ্রলোকদের এই ব্যবহার আমি সমর্থন করতে পারি না।

খুব স্মার্ট সেজে আমিও নিজের দিকে তাকালাম। ওঃ, কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। সেলুনের চাদরটি তখনো আমার গলায় বাঁধা। গলায় সেলুনের চাদর, মাথায় আধাছাঁটা চুল—না, ভদ্রলোকদের তাকানোর একটা সঙ্গত কারণ আছে।

এতক্ষণে আমার মনে পড়ে গেল যে আমি সেলুন থেকে বেরিয়ে আসার সময় সীতানাথ হা-হা করে উঠেছিল বটে। সীতানাথের উপরে আমার রাগ হতে লাগল; হা-হা না করে সীতানাথের উচিত ছিল তাড়াতাড়ি আমার চাদরটি খুলে নেওয়া। তাড়াতাড়ি আমি না হয় একটা ভুল করে ফেলেছি, কিন্তু সীতানাথের ভুল করা উচিত হয়নি। সীতানাথের বৌয়ের তো আর প্রসববেদনা ওঠেনি।

এসপ্ল্যানেড পার হয়ে এলাম।

বারংবার ওই ছেলেটির মুখ মনে পড়তে লাগল আমার, বারংবার কানের কাছে বাজতে লাগল ছেলেটির গলা—ভবতোষবাবু, আপনার

বৌয়ের প্রসবব্যথা উঠেছে আপনি এক্ষুনি বাড়ি চলে যান।

আহা, বড়ো পরোপকারী ছেলে। অন্যের বৌয়ের প্রসব-ব্যাথার খবর দিতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে। আজকালকার দিনে এরকম ছেলে বড়ো একটা দেখা যায় না। যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরছে, অন্যের বিপদ-আপদ নিয়ে কে আর মাথা ঘামাচ্ছে বলুন।

বাঙলার ঘরে ঘরে এইরকম সোনার চাঁদ ছেলে হোক।

এই ছেলেটির নাম জেনে, নেওয়া উচিত ছিল আমার। আমার বৌয়ের যদি ছেলে হয় এবং এই পরোপকারী ছেলেটির নাম যদি জানতে পারি তাহলে এই ছেলেটির নামেই আমি আমার ছেলের নাম রাখব।

সীতানাথ হয়তো এই পরোপকারী ছেলেটিকে চেনে। এক-দিন সীতানাথকে জিজ্ঞেস করতে হবে। একদিন কেন আবার আজই জিজ্ঞেস করব। কাজকর্ম চুকিয়ে সীতানাথের কাছে আজ তো যেতেই হবে, আধাছাটা চুল নিয়ে তো আর জীবন কাটানো যায় না।

হাতিবাগান পার হয়ে এলাম।

খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে বাস। নাঃ স্টেটবাসের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ঝরঝরে ইঞ্জিন ফেলে দিয়ে গভর্নমেণ্টের উচিত বাসের সামনে জোড়া বলদ জুড়ে দেওয়া, বাস তাহলে ঠিকমতো যেতে পারে। জলের বদলে জোড়া বলদকে পেট্রল খাওয়ালে হয়তো আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে।

শ্যামবাজার পার হয়ে এলাম।

আমার বৌ হয়তো দারুণ কষ্ট পাচ্ছে এখন। প্রসববেদনায় মেয়েদের শুনতে পাই খুব কষ্ট হয়। সে-সব ব্যাপার ব্যাটাছেলের ধারণার বাইরে। জগতে অন্য বৌদের যেমন হয় আমার বৌয়েরও তেমনি হচ্ছে, তা নিয়ে হা-হুতাশ করলে ন্যাকামি হবে। না, আমি ন্যাকামি করব না। আমি পুরুষের মতো কাজ করব। বৌকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে হাসপাতালে চলে যাব,

বৌকে হাসপাতালে জমা করে দিয়ে আসব। হে মা কালী, যেন সুপ্রসব হয়, যেন কোনো বিপত্তি না ঘটে।

ডেলিভারি কেস হাসপাতালে ক'দিন রাখে? বোধ করি হপ্তাখানেক। হপ্তাখানেক বাদে বৌকে আবার নিয়ে আসতে যেতে হবে হসপাতালে। সেদিন বৌয়ের সঙ্গে আর কে থাকবে? একটা খোকা। কিংবা হয়তো একটা খুকু।

ফিরতি-পথে ট্যাক্সিতে বৌয়ের মাথায় হাত দিয়ে আমি আলগোছে একটু আদর করব। আজ্ঞে, এটা আমাকে করতেই হবে, সব প্রেমিক হাজব্যাণ্ডই এটুকু করে থাকে। তারপর নতুন বাচ্চার গালে আঙুল দিয়ে জিভেদাঁতে একটুখানি চুকচুক করব। চমৎকার জমবে।

ঘটাং করে বাস থেমে গেল। পাইকপাড়া। তরতর করে নেমে পড়লাম। এবং নেমে পড়েই বুঝলাম সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই সর্বনাশ হলো।

পাইকপাড়ায় এলাম কেন? পাইকপাড়ায় তো আমার বাড়ি নয়। আমার বাড়ি তো বালিগঞ্জে।

কপালে দুর্গতি থাকলে কে ঠেকাবে। বিপদের সময়ে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। কাকে দোষ দেব। কপালের দোষ।

কণ্ডাকটারকে জিজ্ঞেস করলাম—কোন বাসটা বালিগঞ্জ যাবে ভাই।

যে-বাসে চেপে আমি এসেছি, কণ্ডাকটার অবাক্যব্যয় আঙুল দিয়ে সেই বাসটাই দেখিয়ে দিল। আমিও অবাক্যব্যয়ে সেই বাসটায় উঠে পড়লাম। দোতলায় গিয়ে নিজের সাবেক সীটেই বসলাম।

আবার একরাজ্য থেকে অরেকরাজ্যে যেতে হবে। আমার কান্না পেতে লাগল। কিন্তু করার তো কিছু নেই। ভগবানের মার সহ্য না করে উপায় কি।

আমার মনে হলো প্রায় এক যুগ পরে বাসটা ছাড়ল।

টিকিট কাটতে এসে কণ্ডাকটার বলল এক্ষুনি ওদিক থেকে

পাইকপাড়ায় এলেন না? আবার এক্ষুনি ফিরে যাচ্ছেন যে?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—জরুরি কাজ আছে।

পয়সা নিয়ে আমার টিকিট দিতে দিতে কণ্ডাকটার এমন-ভাবে হাসল যেন আমার মাথার ঠিক নেই।

মুখে কিছু না বলে আমি মনে মনে কণ্ডাকটারকে বললাম—আচমকা বৌয়ের প্রসববেদনার খবর পেলে তোমারও আমার দশা হতো, তোমারও মাথার ঠিক থাকত না।

শ্যামবাজার পার হয়ে এলাম।

বালিগঞ্জের বদলে পাইকপাড়ায় চলে আসা আমার উচিত হয়নি, মানি খুব ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু ভেবে দেখুন একা আমি দোষী নই, কেবলমাত্র আমাকেই দোষ দিলে সুবিচার হবে না।

ওই পরোপকারী ছেলেটির কথা মনে আছে তো? কী বলেছিল ছেলেটি? 'ভবতোষবাবু, আপনার বৌয়ের প্রসবব্যথা উঠেছে, আপনি এক্ষুনি বাড়ি চলে যান।'

এই, এই হয়েছে গোলমাল। কথাটা ছেলেটির স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল। ছেলেটির বলা উচিত ছিল—ভবতোষবাবু, আপনার বৌয়ের প্রসবব্যথা উঠেছে, আপনি এক্ষুনি বালিগঞ্জে আপনার বাড়িতে চলে যান।

কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি না বলে ছেলেটি আমার যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করেছে। বৌয়ের প্রসবব্যথার খবর পেলে লোকে নিজের বাবার নাম ও নিজের বাড়ির ঠিকানা একই সঙ্গে ভুলে যায়, একথা ছেলেটির মনে রাখা উচিত ছিল।

এসপ্ল্যানেড পার হয়ে এলাম।

কত অল্পেই আমরা মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য করে ফেলি। একটু আগে ছেলেটিকে পরোপকারী বলেছিলাম। পরোপকারী না কচু। অত্যন্ত বাজেমার্কা ছেলে। স্টুপিড। বদমায়েস। হারামজাদা।

এলগিন রোড পার হয়ে এলাম।

কিন্তু সীতানাথের কাছে অবশ্যই ছেলেটির নাম জেনে নিতে

হবে। আমার যদি ছেলে হয় তো ভুলেও যেন এই স্টুপিড ছেলেটির নামের সঙ্গে তার নামের মিল না হয়।

হাজরা রোডের মোড়। জানলা থেকে আমার সেলুনটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখানে তো শেষ পর্যন্ত আমাকে আসতেই হবে। এখনো আমার গলায় এই সেলুনের চাদর ঝুলছে।

লাল আলো। বাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত্র-ত্র করছে। বাবা, হলুদ কর, নীল জ্বালা। আমার বৌয়ের প্রসবব্যথা উঠেছে।

দপ করে হলুদ জ্বলে উঠল। এবং সেই মুহূর্তেই আমি চলতি বাস থেকে হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম সেলুনে।

সীতানাথ তো আর বসে নেই, আরেকজন খদ্দেরের মাথা নিয়ে পড়েছেঃ আমি যখন বেরিয়ে যাই তখন এই খদ্দের লাইন দিয়ে বসে খবরকাগজ পড়ছিলেন, আমার মনে আছে। দোকানে খুব ভিড়।

কাঁচি চালাতে চালাতে সীতানাথ আমার দিকে তাকিয়ে বলল—বাড়ির খবর ভালো তো বাবু?

আমি নিশ্বাস ছেড়ে বললাম—ভালো, সীতানাথ খুব ভালো।

সীতানাথ বিজ্ঞের মতো বলল—ভালো হলেই ভালো বাবু। দিনকাল তো ভালো নয়।

সীতানাথ বহুকাল ধরে আমার চুল ছাঁটে। ওর কাছে কথাটা গোপন করা উচিত নয়, আমি মনে মনে ভাবলাম। বললাম—দিনকাল ভালো নয় বলেই আমার একটু ভুল হয়ে গেছে সীতানাথ।

—ভুল?

—ভুল। সীতানাথ, আমার বৌয়ের প্রসবব্যথা ওঠার কথা নয়।

সীতানাথ রাগ করে বলল—ওই ছোকরাটা দারুণ পাজি তো। এরকম ভুল খবর সে কেন আপনাকে দিল? আপনি চেনেন ছোকরাটাকে?

—না, চিনি না। কথাটা কী জানো, অবশ্যি আগেই আমার খেয়াল করা উচিত ছিল, আমার বিয়েই হয়নি এখনো। যার বিয়েই হয়নি তার বৌয়ের···

সীতানাথের হাত থেমে গেছে। শুধু সীতানাথ নয়, সীতানাথের হাতে এক্ষুনি যিনি চুল ছাঁটাচ্ছেন, তিনি পর্যন্ত অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

সীতানাথ বিড়বিড় করে বলল—এমন ভুলও মানুষের হয়। কাটা দরজা ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে ছেলেটি তো চিৎকার করে বলেছে, 'ভবতোষবাবু, আপনার বৌয়ের প্রসবব্যথা উঠেছে, আপনি এক্ষুনি বাড়ি চলে যান।'

সীতানাথের হাতের খদ্দের ঘাড় নেড়ে বললেন—হ্যাঁ, আমি তখন বেঞ্চিতে বসেছিলাম, ছেলেটি ওই কথাই বলেছে, স্পষ্ট বলেছে, আমিও নিজের কানে শুনেছি, কোথাও কোনো ভুল নেই।

সীতানাথের কাছে কিছুই গোপন করব না। বললাম—আমিও শুনেছি, ঠিকই শুনেছি, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটু ভুল করে ফেলেছি। ব্যাপারটা কী জানো, আমার নামই তো ভবতোষ নয়।

সীতানাথ প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল, সীতানাথের জ্ঞান ফিরিয়ে আনালেন সীতানাথের হাতের খদ্দের। চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—বাঁচালেন দাদা। আপনার ভুল জেনে মনে পড়ে গেল আমারও একটা ভুল হয়ে গেছে, আমার নিজের নামটি মনে পড়ে গেল এতক্ষণে, আমারই নাম ভবতোষ, আমারই বৌ···

বলতে বলতে মাথায় আধছাঁটা চুল আর গলায় সেলুনের চাদর জড়িয়ে ভদ্রলোক চোখের পলকে উধাও হয়ে গেলেন।

—